পরিচিতি

এই ছোট্ট পুস্তিকাটিতে তাবলীগী জামাত এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে পাঁচটি নিবন্ধ তুলে ধরা হল–এ নিবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে মাসিক 'আল ফুরকানে' প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম নিবন্ধটি হল–'তাবলীগী জামাত এবং তার কার্যক্রমঃ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি'। এ প্রবন্ধটি ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে 'আল ফুরকানে' প্রধান শিরোনামে ছাপা হয়েছিল। এতে তাবলীগী জামাতের দাওয়াত এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। তাবলীগের চেষ্টা প্রচেষ্টায় যাদের কখনো আমলীভাবে শরীক হওয়ার সুযোগ হয়নি, তারা এটি পাঠ করে অন্ততঃ তাবলীগ সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং এ অভিজ্ঞতা তাদের জন্য তাবলীগের সাথে বাস্তবে শরীক হওয়ার ওসীলাও হয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ্।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হল–'তাবলীগী জামাত সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন ও তার জবাব'। এ প্রবন্ধটিতে তাবলীগী জামাত সম্পর্কে একজন সি, আই, ডি অফিসারের পক্ষ থেকে এমন কতিপয় জিজ্ঞাসা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে, যেগুলো অনেকের মনেই উদ্রেক হয়ে থাকে। এটিও ১৯৭৭ সালের আগষ্ট সংখ্যায় 'আল ফুরকানে' প্রকাশি হয়।

তৃতীয় প্রবন্ধটি 'জামাতে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মওদুদী সাহেবের লিখা। আজ থেকে ৪০ বৎসর পূর্বে ১৯৩৯ সালে (তখন তিনি জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেননি) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রাহঃ)-এর তাবলীগী কার্যক্রম দেখা এবং বুঝার জন্য তিনি দিল্লী এসে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং সে সময় তাবলীগী কার্যক্রমের বিশেষ ময়দান মেওয়াত এলাকা এতদ উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করেছিলেন। এ সফরে তিনি যা কিছু স্বচক্ষে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন তা নিজের পত্রিকা 'তরজমানুল কুরআনে' 'একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী আন্দোলন' শিরোনামে প্রকাশ করেছিলেন এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৫৮ হিজরীর শাবান মাসে। তরজমানুল কুরআন থেকে নিয়ে এ প্রবন্ধটিই ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে 'আল ফুরকানে' প্রকাশ করা হয়। এই নিবন্ধটি জামাতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত সকল সদস্যদের জন্য বিশেষভাবে পাঠযোগ্য।

চতুর্থ প্রবন্ধ 'জামাতে ইসলামী এবং তাবলীগী জামাত।' এ নিবন্ধটি মূলত: একটি নাতিদীর্ঘ প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নকারী লিখেছিল যে, 'জামাতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 'তাবলীগী জামাত' এবং তার কার্যক্রমে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। এর যে জবাব দেয়া হয়েছে সেটিও মূলতঃ দীর্ঘ হয়ে যায়। এটি ৭৯ সালের অক্টোবরে 'আল ফুরকানে' প্রকাশিত হয়।

পঞ্চম প্রবন্ধ 'তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে রেজ্‌ভী গ্রুপের প্রোপাগান্ডা' এটিও জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে লিখা হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, আমাদের এলাকায় রেজ্‌ভী গ্রুপ তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে অপবাদের ঝড় তুলছেন এবং তারা অহেতুক ও নিকৃষ্টতম অপবাদ লাগাচ্ছেন। এটিও ৭৭ সালের নভেম্বরে 'আল ফুরকানে' প্রকাশিত হয়েছিল।

এ প্রবন্ধগুলো একত্রে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করলাম। এগুলো পাঠে ইনশাআল্লাহ্ তাবলীগী জামা'আতের বাস্তব অবস্থা এবং তার দাওয়াত ও কার্যক্রমের পথ পদ্ধতি সম্পর্কে অন্ততঃ সামান্য হলেও জানা যাবে এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে যে সকল কথা-বার্তা না জেনে ভুল বশতঃ এবং জেনে-শুনে হঠকারিতা ও প্রবৃত্তি পূজার কারণে ছড়ানো হচ্ছে, তারও বাস্তবতা বুঝে আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা পুস্তিকাটিকে তার বান্দাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং কবুল করুন।

মুহাম্মদ মনজূর নোমানী

২৯শে মুহাররম ১৪০০ হিঃ ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং

তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

-মাওলানা মনজূর নোমানী

আমাদের এই উপ-মহাদেশেই [ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ] শুধু নয় বরং এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায়ও সম্ভবতঃ এমন কোন দেশ কিংবা এলাকা এরূপ নেই, যেখানে মুসলমানদের বসবাসযোগ্য কোন এলাকা রয়েছে অথচ সেখানে 'তাবলীগ জামাত' দ্বীনের মেহনত ও দাওয়াত নিয়ে পৌঁছেনি, কাজ করেনি। লক্ষ-কোটি মুসলমান-যাদের সাথে দ্বীনের খাদেম তাবলীগীদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাঁরা নিজের জ্ঞান ও ধারণানুযায়ী এতটুকু অবশ্যই জানেন যে, তাবলীগ জামাতওয়ালাদের উদ্দেশ্য ও তাঁদের দাওয়াতের মূল ভিত্তি হচ্ছে-আমরা সকলেই যেন প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাই এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে যেন ঈমান ও ঈমানওয়ালা জীবনের ব্যাপকতা লাভ করে। যে দাওয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরাধামে তাশরীফ এনেছিলেন এবং পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের দাবীও এটাই যে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে মূমিন হও।' 'হে মুমিন সকল! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।' (সূরা বাকারা, আয়াত-২০৮)

এ কাজের জন্যে তাদের একটি বিশেষ প্রোগ্রাম ও কার্য পদ্ধতি রয়েছে।

তাদের সর্বপ্রথম আহবান। তোমরা কালেমা শরীফ لا اله الا الله محمد رسول الله -এর গুরুত্ব ও বাস্তবতা অনুধাবন কর।

এ কালেমার মাঝে যা কিছু বলা হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস নিজের অন্তরে স্থাপন করে উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কর এবং একেই স্বীয় জীবনের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করে নাও।

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আমাদের লা-শরীকী গোলামী ও ইবাদতের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটা কালেমায়ে তাওহীদের একান্ত দাবী। সাইয়েদেনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ, আনুগত্য ও মহাব্বতের পদ্ধতিও হচ্ছে-لا اله الا الله محمد رسول الله-এর উপর ঈমান আনয়ন করা।

মোটকথা তাবলীগীরা স্বীয় দাওয়াতের কার্যক্রম এ কালেমা দিয়েই শুরু করেন। অতঃপর ইসলামী বিধানাবলীর মধ্য হতে নামাযের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা চান, প্রত্যেক মুসলমান নিয়মিত নামায আদায় করুক। যেমনটি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এবং নামাযের বাহির ভিতর উভয় দিক লক্ষ্য রেখে যথাসাধ্য এমনভাবে যেন নামায আদায়ের চেষ্টা চলে, যেভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'লীম দিয়েছেন এবং যে নামায মানুষকে পাক-পবিত্র করে দিয়ে আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য শিক্ষা দেয় এবং আখেরাতের স্মরণ- ধ্যান ও প্রস্তুতির স্বভাব তৈরী করে দেয়। অত:পর প্রত্যেক মুসলমানকে স্বীয় অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্বীন শিখতে উদ্বুদ্ধ করে। [চাই দ্বীনদারদের সংস্পর্শে থেকে হোক কিংবা কিতাবী তা'লীমের মাধ্যমে] এমনিভাবে প্রতিটি মুসলমানের জন্য আল্লাহ্পাকের যিকির ও তার অভ্যাস এবং তা যেন স্বীয় জীবনের এক সাধের কাজ বনে যায়, সে জন্যেও চলবে প্রচেষ্টা (ইল্ম দ্বারা পথের সন্ধান মিলে এবং যিকির পথ চলার শক্তি যোগায়। হাম্দ, তাছবীহ, কুরআন তিলাওয়াত, ইস্তেগফার, দরূদ শরীফ এবং দু'আ এসব যিকিরের অন্তর্ভুক্ত)

সাথে সাথে তারা এ দাওয়াত দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ্র সকল বান্দা বিশেষকরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের সাথে আমাদের আচার-আচরণ যেন হয় তাদের হক এবং মর্যাদানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পন্থায়। পৃথিবীর বুকে আমরা যেন ইসলামী স্বভাব-চরিত্রের উত্তম আদর্শে পরিণত হই।

তাদের দাওয়াতী মেহনতের ভাষ্য এটিও একটি যে, নিজের মাঝে এ সকল বিষয়গুলো সৃষ্টি করার জন্যে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে ঈমান,

ঈমানী গুণাবলী, ঈমান ওয়ালা জীবন এবং দাওয়াতকে ব্যাপক ও প্রসার করার মানসে জামাতরূপে দূর–দূরান্তে সফর, হিজরত, এ পথে স্বীয় আরাম–আয়েশ, সময় ও মাল কুরবানী করাকে স্বীয় জীবনের একটি বিরাট অংশ হিসেবে মেনে নিতে হবে। বিশেষ করে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে এ সকল বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এবং দূরে থাকবে এমন সব বিষয় থেকে যেগুলো না দ্বীনের জন্য উপকারী না দুনিয়ার জন্য, যদিও সেগুলো বৈধ হোক না কেন।

তাদের সর্বশেষ কথা হচ্ছে–এ সকল মিশন এবং জীবনের সকল কার্যক্রম একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পরকালের সাওয়াবের জন্যই যেন হয়। পার্থিব কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিংবা উপকার লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকবে না।

জীবনের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে অবস্থা যেন এরূপ দাঁড়ায় 'আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্ববিধাতা আল্লাহ্রই জন্যে। যার কোন শরীক নেই। এজন্যেই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্য স্বীকারকারী'। (সূরা–আন'আম, আয়াত–১৬২)

তাঁরা তাঁদের ক্রমধারায় কোন শাইখের হাতে বাইয়াত হওয়া, কোন সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, কোন জামাত বা দলের সদস্য বা সহযোগী হওয়া, অথবা কোন বিশেষ ফেক্হী মত কিংবা সুফিয়ানা পন্থা অবলম্বনের দাওয়াত দেন না, বরং উপর থেকে জোর তাকিদ দেয়া হয় এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকতে এবং বলা হয়–শুধু আল্লাহ্, রাসূল, দ্বীনী যিন্দেগী এবং দ্বীনী দাওয়াতের মেহনতের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে।

আমি (লেখক) বার বার হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)-এর মুখ থেকে নিজ কানে শুনেছি। তিনি জোর তাগিদ দিয়ে বলতেন–তোমরা দ্বীনি দাওয়াতের এ মেহনতী কাজে আমার ব্যক্তিত্ব এবং আমার নাম উল্লেখ না করার চেষ্টা করবে।

মোদ্দাকথা তাবলীগ জামাত যেখানেই থাক, তাঁরা উপরোল্লেখিত বিষয়াবলীর উপরই তাঁদের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে থাকেন।

জামাতের আহ্লে ইল্ম হযরতগণ এই বিষয়গুলোই স্বীয় ইল্মী পদ্ধতিতে বলে থাকেন। অন্যান্য যাদের লিখা-পড়া কম, তারা স্বীয় জ্ঞান

অনুযায়ী এ কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেন। (এ সিলসিলাই তাদের মাদ্রাসা এবং বিদ্যা পীঠ) তাবলীগী এ সফরে সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় খরচ নিজের সার্থানুযায়ী নিজেই বহন করে থাকেন।

তাঁদের কেউ কেউ পরকালীন সাওয়াব লাভের প্রত্যাশায় হাজার-লক্ষ টাকা খরচ করে প্লেন কিংবা জাহাজ যোগে দূরদেশ পর্যন্ত সফর করে থাকেন। অনেকেই সফর করে থাকেন বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে। আবার অনেককেই আল্লাহ্ সে সামর্থ দেননি বিধায়, যৎসামান্য ছামান মাথায় করে মাসের পর মাস পায়ে হেঁটে সফর করেন। আল্লাহ্র এ বান্দাদের সফরে সাধারণতঃ রাত্রি যাপনের স্থান হয় আল্লাহ্র ঘর মসজিদ কিংবা খোদার দেয়া যমীন।

যাদের মুখ দিয়ে ঠিকমত কালেমায়ে তাইয়্যেবা উচ্চারিত হয় না, তারা কালেমা এবং তার সাথে নামাযের অনুশীলন করেন। যারা কুরআন শরীফ পড়তে জানেন না তারা সাথীদের কাছ থেকে কুরআন শরীফ শিখেন। নফল ইবাদত এবং যিকিরের অভ্যাস করেন। সৎ চরিত্র গঠন, অন্যের খিদমত, নিজে না খেয়ে অপর ভাইয়ের প্রতি এহসান এবং একরামের অনুশীলন করেন।

নিশুতি রাতে উঠে আল্লাহ্র দরবারে তাওবা এবং রোনাজারীকারীদের ইস্তেগফার ও ক্রন্দনের হালাত দেখে তাদের অন্তরেও আকাংখার জোয়ার আসে এবং তারাও এ দৌলত অর্জনে প্রচেষ্টায় লেগে যান। অতঃপর অনেককেই আল্লাহ্ সে অমূল্য নেয়ামত দান করে থাকেন।

এ সকল বিষয় সম্পর্কে তারাই জ্ঞাত, জামাতের সাথে যাঁদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং যাঁরা এদের সাথে সময় দিয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তাঁর (হযরত মাওলানা ইলিয়াস [রাঃ]) এ দাওয়াত, মেহনত ও তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলে কত–শত লক্ষ-কোটি বান্দার কলুষিত জীবন সিরাতে মুস্তাকীমের সঠিক ও সুন্দর পথে এসেছে।

তাবলীগী জামাত সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর

-মাওলানা মনজুর নোমানী

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পূর্বের কথা। তখন আমি বসবাস করতাম লক্ষ্ণৌর অন্তর্গত বেলুচপুরা নামক স্থানে। বাড়ির পাশেই মহল্লার রওনক 'ছিদ্দিকী মসজিদ'টি অবস্থিত ছিল। রমজান মাস ছিল বিধায় সে মসজিদেই আমি এতেকাফ করছিলাম। একদিন সকাল বেলা ৯টা কি ১০টায় এক সাথী ভাই এসে জানালেন-এক ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। মনে হচ্ছে অমুসলিম কোন সরকারী লোক হবেন।'

আমি বললাম-তাকে বলে দিন আমি এ সময় বাইরে আসতে পারব না, বরং ভদ্রলোক এখানেই যেন চলে আসেন।

ভদ্রলোক আসলেন এবং খুবই বিনম্রভাবে আদবের সাথে কুশল বিনিময়ের পর পরিষ্কারভাবেই বললেন-আমি সি, আই, ডি অফিসে চাকরী করি। যদি আপনি আমায় এজাযত দেন, তাহলে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কিছু কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। আমি বললাম-আপনি নিঃসংঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারেন- তাবলীগ জামাত সম্পর্কে আমার যেটুকু জানা রয়েছে, সেটুকু আপনাকে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্।

ইতিমধ্যে তিনি ব্যাগ থেকে এক খন্ড কাগজ বের করলেন। কাগজটিতে সম্ভবত: ইংরেজীতে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন লিখা ছিল। একটি প্রশ্ন করতেই আমি তাকে বললাম-আপনার যত প্রশ্ন রয়েছে সবগুলোই উল্লেখ করুন। এবার তিনি আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। আমি বললাম, সর্বপ্রথম তাবলীগী জামাতের কিছু ইতিহাস এবং এ কাজের বিশেষ অবস্থা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা সঙ্গত মনে করছি। সেগুলো

আপনি খুব্ই মনযোগের সাথে শুনে নিন। অত:পর আপনার প্রশ্নগুলো উত্থাপন করুন। ফলশ্রুতিতে আশা করি আপনি প্রশ্নের জবাবগুলো উত্তমভাবে বুঝে নিতে সক্ষম হবেন।

এবার আমি নিজের অভিজ্ঞতানুযায়ী হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং মেওয়াত এলাকায় যেভাবে তিনি এ কাজ শুরু করেছিলেন তার পটভূমি এবং এ কাজের সু-ফলসমূহ উল্লেখ করলাম। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য এলাকায় এ কাজ কিভাবে সম্প্রসারিত হল এবং এ কাজের ধারা ও বিশেষ পদ্ধতি এবং তাবলীগী জামাতওয়ালাদের দূর দূরান্তে সফরের মাক্সাদ এবং তাদের দিন রাতের প্রোগ্রাম এবং সংঘবদ্ধতা, দাওয়াত এসব কিছুই সে আলোচনায় এ অধম বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে।

আলোচনায় এ প্রসঙ্গটাও এসেছে যে, তাবলীগী জামাত কোন নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন নয়। নেই এর কোন সদস্য বা রোকন। নেই কোন সভাপতি বা সেক্রেটারী। নেই কোথাও এর দফতর কিংবা রেজিষ্ট্রিখাতা, যার মধ্যে জামাত ও জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া এর কোন নির্দিষ্ট ফান্ডও নেই।

মোটকথা, আমাদের মসজিদগুলোতে যেমন দিনে পাঁচ বার নামাযের জামাত হয়ে থাকে, এটিও ঠিক এরূপ একটি জামাত।

আমি আমার আলোচনা ঘন্টাখানেকের মধ্য সমাপ্ত করে ফেলেছিলাম। ভদ্রলোক খুবই মনোযোগের সাথে এবং বাস্তবিকই খুব ধ্যানের সাথে কথাগুলো শুনছিলেন এবং কিছু কিছু নোটও করছিলেন। আলোচনা চলাকালে কোন বিষয় তার বুঝে না আসলে বলত–জনাব অমুক বিষয়টি আমি বুঝতে পারিনি আপনি আবারও একটু বলুন। আমিও তার আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে ২য় বার তা বুঝিয়ে দিতাম।

এরপর আমি তাকে বললাম–এবার আপনার যা কিছু জিজ্ঞাসা করার করতে পারেন।

তিনি তার প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের সামনে নিজেই তার উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখতে শুরু করলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করে

বললেন–আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি। তার সাথে স্বত:স্ফূর্তভাবে এটাও প্রকাশ করলেন যে, আপনার এ আলোচনার দ্বারা আমার অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। সবশেষে তিনি বললেন–একটি বিষয় আমার অন্তর তো সায় দিয়েছে যে, প্রকৃত ব্যাপারটা তাই হবে, যা আপনি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সমস্যা হলো, বিষয়টি সম্পর্কে আমি আমার অফিসারদের আশ্বস্থ করতে পারব না।

সেটা হলো–আপনিই বলেছেন এবং আমারও জানা রয়েছে যে, তাবলীগ জামাতের কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী যেমনিভাবে হচ্ছে, তেমনিভাবে পাকিস্তানেও হচ্ছে এবং অন্যান্য দেশেও হচ্ছে। অথচ আপনি বললেন–এর কোন সদস্য বা সভাপতি এবং সেক্রেটারী নেই এবং কোথাও এর দফতর নেই, এর জন্য কোন চাদাও উঠানো হয় না। বিষয়টি বুঝা খুবই কঠিন যে, এ সকল কিছু ব্যতীত এতবড় একটি কার্যক্রম কিভাবে চলতে পারে এবং কিভাবে এর সম্প্রসারণ হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাব তখনই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। বললাম–বিষয়টি এক্ষুণি আপনার বুঝে আসবে এবং আমি বিশ্বাস করি আমার কথা শুনে আপনি সবাইকে আশ্বস্থ করতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ। (আমি বললাম) আপনি বলুন, হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা পৃথিবীর কোথায় কোথায় অবস্থান করছে। তিনি বললেন, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, শ্রীলংকা, নেপাল তথা সব দেশেই এবং কম-বেশী চীন, জাপান এবং ইউরোপের দেশগুলোতেও রয়েছে। এরপর বললাম–বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা কোন কোন দেশে রয়েছে? তিনি বললেন–হিন্দুস্থানে তো রয়েছেই, তবে চীন, জাপান, বার্মা এবং তিব্বত ইত্যাদি দেশেও রয়েছে। অত:পর বললাম খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীরা কোন কোন দেশে রয়েছে? তিনি বললেন–আমেরিকা, ইউরোপের সকল দেশেই রয়েছে এবং এশিয়া, আফ্রিকারও সব দেশে এদের অবস্থান এমনকি গোটা দুনিয়ায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে ওরা নেই।

আমি বললাম–ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা কোন কোন দেশে অবস্থান করছে? তিনি বললেন, এদের অধিকাংশই তো আরব দেশগুলোতে, তবে

পাকিস্তান, হিন্দুস্থান এবং কম বেশী পৃথিবীর সব দেশেই এদের অবস্থান। অত:পর তাকে বললাম–আপনি ইতিহাস নিশ্চয় পড়েছেন–ইতিহাসের পাতায় কোথাও কি একথা পেয়েছেন যে, হিন্দু-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ কিংবা গৌতমবুদ্ধ কিংবা হযরত ঈসা (আঃ) কিংবা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তার প্রাথমিক সাথী ও অনুসারীরা স্বীয় ধর্মের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে দ্বীন–ধর্মের প্রচার প্রসার করার জন্যে কোন পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিংবা কোন সংস্থা স্থাপন করেছিলেন? যার নির্ধারিত সদস্য এবং সভাপতি, সেক্রেটারী দায়িত্বশীল ছিলেন, যাঁরা চাদা তুলে এর জন্য কোন ফান্ড কায়েম করেছিলেন।

তিনি উত্তরে বললেন–না, ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বলেই তো আমরা জানি।

আমি বললাম–আসল কথা কি, যে কাজ একান্তভাবে দ্বীনের জন্যে হয়, যাতে পার্থিব কোন উদ্দেশ্যের সংশ্লিষ্টতা নেই এবং যা শুধুই রেযায়ে মাওলার জন্যে এবং আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ্‌র সাথে জুড়ে দেয়া এবং বিশেষ করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মুক্তি ও সফলতা অর্জনের জন্যে করা হয়, সে কাজের জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন পার্টি বা সংস্থা এবং তাতে সদস্যের প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন পড়ে না চাদা তুলে এর জন্য কোন ফান্ড তৈরী করার।

বরং তার তরীকা হল–লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে আহবান করা। অতঃপর যে এ পথে এসে যায় তাকে বলা হয় তুমিও এমনিভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে তার নির্দেশিত পথে ডাক এবং যথাসম্ভব নিজেকে এবং নিজের প্রতিটি বিষয়কে তার জন্য উৎসর্গ করে দাও।

ব্যাস! এমনিভাবে কাজ চলছে এবং এর বিস্তার ঘটছে। আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর এবং পথপ্রদর্শকগণ এমনিভাবে কাজ করে গেছেন। তাবলীগী জামাতের কাজও এভাবেই হচ্ছে।

আমার কথাগুলো শুনে উক্ত ভদ্র লোক বলে উঠলেন– এবার আমি সব বুঝে নিয়েছি এবং অন্যকেও বুঝাতে এবং আশ্বস্থ করতে সক্ষম হব। এ বলে তিনি বিদায় নিলেন।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ও একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

-মরহুম মওদুদী

(মওদুদী সাহেবের এ নিবন্ধটি আজ থেকে ৪০ বৎসর পূর্বের লেখা। ১৩৫৮ হিজরীর শা'বান মাসে (১৯৩৯ অক্টোবর) তরজমানুল কুরআনে 'একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী আন্দোলন' শিরোনামে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে প্রবন্ধটিতে যে শিরোনাম দেয়া হয়েছে সেটা আল-ফুরকান পত্রিকার পক্ষ থেকে দেয়া।)

গত রজব মাসের শেষ দিকে দিল্লীর নিকটবর্তী একটি এলাকায় আমার যাওয়ার সুযোগ হয়। যে এলাকাটি মেওয়াত নামে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘদিন যাবত শুনে আসছিলাম সেখানে মাওলানা ইলিয়াস কান্দলভীর (রাহঃ) নেতৃত্বে নীরবে একটি আন্দোলন চলে আসছে। যা দশ/বার বৎসরের ব্যবধানে ঐ এলাকার অবস্থা আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৌতুহল আর আমার সন্ধানী মন আমাকে বাধ্য করল স্বয়ং গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসতে। সে ভ্রমনে আমি যা কিছু স্বচক্ষে দেখেছি এবং যেটুকু ফলাফল আহরণ করেছি, তা তরজমানুল কুরআনের পাঠক ও শুভাকাংখীদের খেদমতে পৌছে দিচ্ছি। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার যে বান্দা বাস্তবিকপক্ষেই দ্বীনের জন্য কিছু কাজ করতে চায়, সে যেন কাজ করার এক সঠিক ও সুন্দর তরীকা সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে সক্ষম হয়।

মেওজাতির বসবাস দিল্লীর পাশেই আলোর, ভরতপূর, গোড়গানূহ এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী এলাকায়। অত্র এলাকার মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৩২ লক্ষের কম হবে না। এখন থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে সম্ভবত: হযরত নিজামুদ্দীন মাহবুবে এলাহী (রাহঃ) এবং তাঁর খলীফা ও অনুসারীদের প্রচেষ্টায় এ জাতির মাঝে ইসলাম পৌছেছিল। কিন্তু আফসোস! পরবর্তীকালে মুসলিম শাসক এবং জায়গীরদারদের গাফলতির কারণে

সেখানে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই ফলাফল এই দাঁড়াল যে, যারা হুকুমতের একান্ত নিকটবর্তী অবস্থান করছিল, তাদের মধ্যে প্রাচীনকালের সকল বর্বরতা ফিরে আসল এবং ধীরে ধীরে তারা ইসলাম হতে এই পমিোণ দূরে সরে পড়ল যে, তাদের মধ্যে 'আমরা মুসলমান' শুধু এই ধারণাটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অবশিষ্ট ছিল না তাদের মুসলমানী নাম পর্যন্ত। নাহার সিংহ, ভিপি সিংহ ইত্যাদি নামে তাদেরকে ডাকা হত। তাদের মাথায় শোভা পেত চুলের খোপা। রীতিমত মুর্তি পুজায় লেগে গিয়েছিল তারা। নিজের চাওয়া-পাওয়া আল্লাহ্‌র কাছে না চেয়ে চাইত হাতে গড়া ঐ সকল দেবদেবীর কাছে। তাদের পূর্বপুরুষরা পুরাতন যামানায় যে প্রতিমার পূজারী ছিল সে পূজার দিকে ফিরে গেল তারাও।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের মাঝে এমনভাবে ছেয়ে গিয়েছিল যে, সাধারণ গ্রাম্য লোকদের কালেমা পর্যন্ত জানা ছিল না। এমনকি নামাযের বাহ্যিক সুরতের সাথেও তারা অপরিচিত হয়ে পড়েছিল। ঘটনাক্রমে কোন মুসলমান সে এলাকায় পৌঁছে নামায পড়তে শুরু করলে গ্রামের পুরুষ মহিলা ও বাচ্চারা কৌতুহল বশত: তার আশে পাশে একত্রিত হয়ে যেত। নামাযের রুকু সিজদাকে এক ধরনের অদ্ভুত কাজ মনে করত। ভাবত যে, হয়ত লোকটার পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে কিংবা পাগল হয়ে গেছে। অন্যথায় এভাবে উঠা-বসা করছে কেন। শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং জাহিলী যুগের সকল বর্বরতা আর পশুত্ব তাদের মাঝে ছেয়ে গিয়েছিল। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা তো পাওয়াই যেতো না। এমনকি পবিত্রতা অর্জনের প্রাথমিক নিয়ম কানুন সম্পর্কেও তারা ছিল অজ্ঞ। নারী পুরুষ সব উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। হায়া শরমের জলাঞ্জলী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী সহ সকল অপকর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল ব্যাপার। কোন মুসাফিরের জন্য একাকী ঐ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করা ছিল মুশকিল। তাদের কবিলা এবং গোত্রগুলোর মাঝে জাহিলী প্রথা-প্রচলন নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বদা এমনভাবে লেগেই থাকত, যেমনভাবে লেগে থাকত আরব্য জাহিলী যুগের লোকদের মাঝে। তাদের আবাদীগুলো বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত ছিল। প্রায় সময়ই এক এলাকার লোকদের সাথে অন্য এলাকার লোকদের নারী, জন্তু বা অন্য

কোন কিছুর সূত্র ধরে শুরু হত জিঘাংসা। যার ধারা চলত যুগ যুগ ধরে। তাদের উদ্যম, বাহাদুরী, বাহুবল, গোত্রীয় শক্তি-সামর্থ এভাবেই নিঃশেষ হতে চলছিল। খুঁজে পাচ্ছিল না তারা এর থেকে উত্তরণ ও উন্নতি-অগ্রগতির কোন পথ। এমনকি নিজ প্রতিবেশীর জন্যও ছিল একে অন্যের ত্রাস। সুতরাং ঐ সকল এলাকায় যাদের সরকারীভাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের অভিযোগ হল–ইংরেজ হুকুমত এবং আলোর, ভরতপুরের জমিদারী শাসনও সেখানে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও তামাদ্দুনিক পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়েছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) সেখানে কাজ শুরু করেছিলেন এবং দশ/বার বছরের এ সংক্ষিপ্ত সময়েই এ বর্বর জাতির অধিকাংশের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমানে সেখানে প্রায় আড়াইশত মাদ্রাসা রয়েছে। সব মাদ্রাসায় এসে গ্রামের ছেলেরা দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে। এদের মধ্যে যারা দ্বীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাদের জন্য রয়েছে–দিল্লীর নিকটবর্তী হযরত নিজামুদ্দীন মাহবুবে এলাহী এলাকায় অবস্থিত বড় মাদ্রাসা। যার বদৌলতে এ পথ বিপন্ন মানব সমাজ ইসলামের সু মহান মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মাদ্রাসাগুলোতে শুধু দ্বীনি ইলমই শিক্ষা দেয়া হয় না, বরং ছাত্রদেরকে খালেস দ্বীনের তরবিয়াত দেয়া হয় এবং তাবলীগ ও আমলের ইসলাহী মশ্‌ক করানোর জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে নিয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ মাদ্রাসাগুলোর বরকতে মেওয়াতের লোকদের মধ্য থেকে উলামা মুবাল্লিগীনের উল্লেখযোগ্য একটি দল তৈরী হয়ে গেছে। যারা এই পথভ্রষ্ট জাতিকে দ্বীনের পথে সর্বদা কায়েম রাখার যিম্মাদার বনে গেছেন। আল্লাহ্‌র ফজলে মাওলানা স্বয়ং এ জাতির মুবাল্লিগদের কাছ থেকে ইসলাহের (আত্মশুদ্ধির) কাজ নিয়েছেন এবং তাঁরই লাগাতার প্রচেষ্টার যে সুফল আমি স্বচোখে দেখে এসেছি তা নিম্নে প্রদত্ত হল–

কোন এলাকায় গ্রামের পর গ্রাম এমনও রয়েছে যে, সেখানে একজনও বে-নামাযী পাওয়া–যাবে না। গ্রামের যে সকল মসজিদগুলোতে তারা তাদের পালিত পশু বেঁধে রাখত, আজ সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আযান ও জামাতের সাথে আদায় হচ্ছে। কোন পথিককে আপনি দাঁড় করিয়ে তার পরীক্ষা নিন–সে আপনাকে বিশুদ্ধভাবে কালেমা শুনিয়ে দিবে।

ইসলামী শিক্ষার সোজাসুজি মৌলিক বিষয়াদি যা একজন গ্রাম্য বৃদ্ধ লোকের জানার কথা। জিজ্ঞেস করুন আপনি–পরিস্কার বলে দিবে এবং আপনাকে এও বলে দিবে যে, ইসলামের আরকান কি কি। এখন আপনি সেখানে কোন মহিলা বা বাচ্চাকে হিন্দুয়ানী পোষাকে দেখবেন না এবং দেখবেন না কাউকে সতর খোলা অবস্থায়। তাদের বাড়ী ঘর কিংবা পোষাকে-আশাকে দেখবেন না নাপাকি বা অপবিত্রতার ছোঁয়া। তাদের অভ্যাস, স্বভাব ও চরিত্রের মাঝে এক মহা পরিবর্তনের দোলা লেগেছে তাবলীগী তা'লীমের মহান পরশে। তাদের জীবন এখন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মীয় তাহযীব, তমুদ্দন ও সভ্যতার দিকে। সকল অন্যায় অপকর্ম যেন আশ্চর্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। ঝগড়া, ফাসাদ, মামলা-মুকাদ্দমা একেবারেই কমে গেছে। এলাকাটি যেন সম্পূর্ণ একটি নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এর স্বীকারোক্তি সেখানকার সরকারী বিচারকদের মুখ দিয়েই বের হচ্ছে।

তাদের সমাজ চিত্রে, লেন-দেন, আচার-আচরনে লেগেছে এক বিরাট পরিবর্তনের ছোঁয়া। ফলে আশপাশের এলাকাগুলোতেও এর ভিন্ন রকম প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। এখন আর তাদেরকে অপমান ও অবিশ্বস্থতার দৃষ্টিতে দেখা হয় না, বরং ক্রমশ: তাদের ইয্যত সম্মান প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। মাওলানা গ্রামের সাধারণ গ্রাম্য লোকদের মাঝে তাবলীগ, ইসলাহ (আত্মশুদ্ধি), সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ প্রভৃতির এমন জয্বা তৈরী করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তিটি গতকাল নাগাদ পথভ্রষ্ট ছিল, আজ সে অন্য ভাইকে সত্য-সুন্দর পথের আহবানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেত খামারের কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছোট ছোট দল তাবলীগে বেরিয়ে পড়ছে। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে লোকদেরকে কল্যাণ, সফলতা চিরন্তন মুক্তির দাওয়াত দিচ্ছে। তাঁদের পথের সম্বল, সফরের মাল-ছামান কাঁধে নিয়ে দূর দূরান্ত পর্যন্ত বয়ে চলেছে। একের বোঝা অন্যের উপর তাঁরা ফেলেন না। চান না তাঁরা কারো কাছে নিজের জন্য কিছু। শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই তাঁদের মূল লক্ষ্যবস্তু। ফলে যেখানেই তাঁদের পদচারণা হয়, সেখানেই মহল্লা ও গ্রামের বস্তিগুলোতে এক সীমাহীন প্রভাব পড়ে।

আমি জানতে পারলাম–অধিকাংশ সময়ই তাঁরা পায়দল সফর করে দুইশত মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে থাকেন। যে বস্তির উপর দিয়েই তাঁদের পদভ্রমন হয়, সে বস্তিতেই দ্বীনের জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং কালেমা ও নামাযের নূরে নূরান্বিত হয়ে যায়। গ্রাম্য-বৃদ্ধ মুবাল্লিগদের সাথে আলোচনা করার সুযোগও আমার হয়েছে। তাদের সরলসোজা মুখ দিয়ে যখন তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য শুনলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল–ইসলামের সূচনালগ্নে আরবের গ্রাম্য বৃদ্ধরা প্রাণের যে স্পন্দন ও উদ্দীপনা নিয়ে সিরাতে মুস্তাকীমের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, প্রাণের সেই স্পন্দন ও উদ্দীপনা তাঁদের মাঝেও সৃষ্টি হয়েছে। এক মুর্খ কৃষককে আমি জিজ্ঞেস করলাম–তোমরা এভাবে ঘুরে বেড়াও কেন? সে জবাব দিল–আমরা বর্বরতার গভীর আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের কোন খবর ছিল না। ছিল না রাসূল সম্পর্কে কোন জ্ঞান। এই মওলুভী সাহেবের (মাওলানা ইলিয়াস [রাহঃ]) আল্লাহ্ মঙ্গল করুন। তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এখন আমরা চাই–যে অমূল্য সম্পদের সন্ধান আমরা পেয়েছি, তা আমাদের অন্যান্য ভাইদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে। কৃষকের কথাগুলো শুনে আমার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠল। এই জয্‌বাইতো সাহাবীদের ছিল। যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শিশাঢালা প্রাচীর সম দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছিলেন যে, তাদের জান-মালের কোন খবরও ছিল না।

এই ধর্মীয় ইসলাহ (শুদ্ধি) মেওয়াতের গোত্রীয় বিক্ষিপ্ততাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, যা যুগযুগ ধরে তাদের শক্তি সামর্থ ও সমাজকে কলুষিত করে রেখেছিল। গ্রামের এলাকাগুলোতে ধীরে ধীরে দ্বীনী জলসা শুরু হয়েছে। যাতে লোকেরা জমা হচ্ছে বিশ মাইল পঁচিশ মাইল দূর থেকে। সে মজলিসগুলোতে আট হাজার দশ হাজার লোকের সম্মিলন ঘটে। এক জায়গায় এক সাথে বসে তাঁরা দ্বীনের তা'লীম অর্জন করেন এবং সাথে সাথে ভুলে যান সকল প্রকার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। অত:পর গ্রাম্য এলাকা থেকে যে জামাত বের হয় তারা শুধু দ্বীনের তা'লীমই অর্জন করে না, সাথে সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের বন্ধনও তাঁরা কায়েম করেন।

এমনিভাবে গোত্রীয় বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে ধীরে ধীরে মজবুত হচ্ছে উম্মতের ঐক্য এবং এমন একটি ঐক্যের ভিত সেখানে রচিত হচ্ছে, যার দ্বারা পরবর্তীতে অনেক কিছুই করা সম্ভব। সংঘবদ্ধতার সারকথা এছাড়া আর কি হতে পারে যে, অসংখ্য অগণিত মানুষ একই আওয়াজে একত্রিত হচ্ছে এবং একই আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই কাজটাই সেখানে হচ্ছে এবং খুবই ব্যাপক আকারে হচ্ছে।

উক্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল হাতেগণা মাত্র ক'বছরে বেরিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র একজন মুখলিস ব্যক্তির নিরলস প্রচেষ্টা ও মেহনতের বদৌলতে। সেখানে নেই কোন কমিটি, নেই কোন চাদার ব্যবস্থা, নেই এ আন্দোলনের ভিন্ন কোন নাম, নেই কোন আমীর, নেই-এর প্রচারণার জন্যে কোন পত্র-পত্রিকা। না চলে তাদের মাঝে নিয়মিত প্যারেড, না দেখা যায় ইউনিফরম ও পতাকা প্রদর্শনীর কোন দৃশ্য। দেয়া হয় না এ কাজের জন্য কোন বিজ্ঞপ্তি বিবৃতি। সরল সোজা, সাধাসিধে এক মওলুভী সাহেব মসজিদে বসে শুধু কাজ করে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্যের নিত্য-নতুন প্রচারণা, প্রদর্শনী পদ্ধতি তিনি মোটেও অনুসরণ করেন না। না এ কাজের জন্যে পৃথিবীতে কোন ঢোল পিটানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এক খালেস দ্বীনী জযবার মাধ্যমে তারা কাজ করে যাচ্ছেন সার্বক্ষণিক ধ্যানের সাথে। এ কারণেই এ সকল মওলভীগণ নীরবতার সাথে যে কাজ করে যাচ্ছেন, তা আমাদের বড় বড় সংগঠন ও শক্তিশালী আন্দোলন দ্বারাও সম্ভব হচ্ছে না। যে সকল সংগঠনের নাম পত্র-পত্রিকার প্রধান শিরোনামে দেখতে পাচ্ছেন।

বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের আন্দোলন হিন্দুস্থানের ইসলামী ইতিহাসে হযরত শাইখ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) শুরু করেছিলেন, কিংবা হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (রাহঃ) শুরু করেছিলেন। আর হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় নতুন করে তার রূপ দেয়ার জন্য তৌফিক দিয়েছেন।

(মরহুম মওদুদী সাহেবের এ নিবন্ধটি এখানেই শেষ নয়, তবে বাকী অংশে তিনি তার নিজস্ব কিছু মন্তব্য ও চিন্তাধারা পেশ করেছেন। যা সলফে

সালেহীনের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তাঁরা নেজামে দ্বীনের জন্য হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে করেননি বরং সহায়ক মনে করেছেন এবং দ্বীনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাঁদের নজরে ঈমান ও আ'মালে সালেহা। অপরদিকে মরহুম মওদুদী সাহেবের দৃষ্টিতে দ্বীনের অর্থ ও লক্ষ্য হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী এ লক্ষ্যের জন্য সহায়ক মাত্র। তিনি চিন্তা করেননি যে, হুকুমত যদি দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়, তাহলে লক্ষ্যাধিক নবী-রসূলদের মধ্যে ক'জন কামিয়াব সাব্যস্ত হবেন। তাই অবশিষ্টাংশের অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করিনি–অনুবাদক)

তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীর অপপ্রচার ও তার জবাব

একটি চিঠি ও তার উত্তর

-মাওলানা মনজুর নোমানী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

জনাব! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

আপনার খেদমতে জামাতে ইসলামী এবং তাবলীগী জামাত সম্পর্কিত একটি জরুরী বিষয়ের আবেদন পেশ করছি। আশা করি হযরত এর গুরুত্ব অনুধাবন করে উত্তর প্রদানে বাধিত করবেন।

জামাতে ইসলামীর সামনে এখন সবচেয়ে বড় বাঁধা হল তাবলীগী জামাত এবং তাদের কার্যক্রম। সুতরাং তাবলীগী জামাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাবলীগী জামাতের উপর কতিপয় নিত্য-নতুন অপবাদ চাপানো হচ্ছে এবং বিশেষ করে যুবক শ্রেণীর মাঝে এর প্রচারণা চলছে অধিক পরিমাণে।

জামাতে ইসলামী স্বীয় প্রোপাগান্ডার দ্বারা এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে যে, তাবলীগী জামাত জীবনের একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট অংশকে ইসলামী বানাতে চায়। অথচ জামাতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে-জীবনের প্রতিটি দিককে ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলা। তাবলীগী জামাত মানুষের পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট এ জন্য নয় যে, তাদের সম্পূর্ণ কার্যক্রমের নির্যাস হচ্ছে, নামায, রোযা, কালেমা, কিছু দু'আ শিখানো আর ফাযায়েল বর্ণনা করা। এ কয়েকটি কাজের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত। অথচ জামাতে ইসলামী পূর্ণ ইকামাতে দ্বীনের দা'ঈ। আর ইকামাতে দ্বীন হচ্ছে-কোন ভাগাভাগি ও পার্থক্য ব্যতীতই পূর্ণ দ্বীনকে একনিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করা এবং সর্বদিক থেকে নিষ্ঠার সাথে তা আদায় করা। মানব

জীবনের ব্যক্তিগত ও জাতীয় সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেন ব্যক্তিগত উন্নতি-প্রগতি, সমাজ বিনির্মাণ এবং শাসন ব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা তথা সব কিছুই ইসলামী বিধি নিষেধ অনুযায়ী হয়। জামাতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে–ইকামাতে দ্বীন এবং তাদের সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য রেজায়ে মাওলা তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের কল্যাণসাধন।

অপরদিকে তাবলীগী জামাত মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সামাজিক জীবনে রাজনৈতিকভাবে বা সামাজিকভাবে কোনদিকেরই উল্লেখযোগ্য কোন দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না।

সুতরাং বর্তমান পরিস্থিতিতে এ প্রোপাগান্ডার বিষয়টি; বিশেষ করে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মাঝে তাবলীগ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির এ অপপ্রয়াস খুবই উদ্বেগজনক। তাদের এ অপ প্রচারের প্রতিরোধের জন্যই নয় বরং জনসাধারণকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা ও তাদের মন থেকে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য হলেও এ সকল প্রোপাগান্ডা ও ভুল ধ্যান-ধারণার আপনোদন করা একান্ত জরুরী।

তাই এ ব্যাপারে হযরতের কাছে সবিনয় নিবেদনপূর্বক দরখাস্তের সাথে সাথে আমার আশা–আপনি এ সবের উচিত ও আশ্বস্তকর জবাব প্রদান করে জাতিকে উপকৃত করবেন। এর ফলে তাবলীগী জামাতের যে চিত্র জামাতে ইসলামী জনসমক্ষে তুলে ধরেছে, তার সঠিক দিকটি মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং ইতিমধ্যে যারা প্রভাবান্বিত হয়ে গেছে, তারাও হয়ত সঠিক পথে ফিরে আসবে।

তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীর প্রোপাগান্ডা নিম্নরূপ ঃ

তাবলীগী জামাত যা কিছু করছে এবং বলছে, তা শুধু জীবনের একটি বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট দিক নিয়ে। তাদের উদ্দেশ্য হলো–মুসলমানদের মধ্যে যারা নামায-রোযা পড়ে না, তাদেরকে নামায শিখানো এবং পড়ানো। কালেমা এবং দু'আ দরূদ সহীহ্ করানো। সাথে সাথে নামায, রোযার ফযীলত বর্ণনা করা। এ ক'টি বিষয়ের তালীমের জন্যই তারা বের হয়ে

থাকে। প্রতিদিন অসংখ্য লোক চিল্লায় যোগ দেয় ও গাশত করার জন্য সফর করে। চিল্লায় গিয়ে কিছু মাসআলা মাসায়িলের মশকও তারা করে। ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করার চিন্তা তারা কখনো করে না। বরং ইসলামকে সংক্ষিপ্তাকারে যেভাবে তারা বুঝেছে, সেভাবেই মানুষদেরকেও বুঝানোর চেষ্টা করছে। তাদের এ ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা এবং বিপথগামী জীবন পদ্ধতি, যা আজ মানব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিচ্ছে তাতে মূলত: তেমন কোন কল্যাণকামিতা নেই। কেন্দ্র থেকে তাদেরকে এ উপদেশও দেয়া হয় যে, তারা যেন জাতীয় সমস্যাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ না করে।

ইসলাম ও মুসলমান হিসেবে দেশের রাজনৈতিক ধারা এবং রাজনৈতিক পার্টিগুলোতে ও হুকুমতের চার দেয়ালের ভিতর কি চক্রান্ত চলছে সে খবর তাদের নেই। 'মুসলিম পার্সোনাল ল' কি জিনিস, এক রকম সিভিল কোড কি? মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার সমস্যার কিভাবে সমাধান হবে এবং-এর গুরুত্ব কতটুকু? জাতিগত দাঙ্গায় মজলুমদের বিষয়টি এবং বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের কোন আকর্ষণ নেই।

অমুসলিমদের মাঝে মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে, তার আপনোদন কিভাবে সম্ভব। অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রচার প্রসার কিভাবে করতে হবে; এসকল বিষয়ে তাদের কোন ভূমিকা নেই। তারা সামাজিক লেন-দেন ও সমস্যাগুলোতে কি নীতি অবলম্বন করছে তারও কোন ফিকির নেই।

উদাহরণ স্বরূপ–যদি কোন ব্যক্তি নামায-রোযার পাবন্দী করে, চিল্লা, গাশ্‌ত এজতেমায়ী আমলে শরীক হওয়ার পাশাপাশি মদের দোকানে ম্যানেজারী করে, অথবা নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেনে সুদ-ঘুষের আদান প্রদান করে, আদালতে মিথ্যা মামলা-মুকাদ্দমা নিয়ে লড়ে। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তাবলীগী জামাত তাকে এগুলো থেকে ফিরাতে পারবে না। কেননা–এগুলো তার ব্যক্তিগত ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি কমিউনিজম, কংগ্রেস, জনতা পার্টি অথবা অন্য কোন দলের

সভাপতি হোক, তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা কি এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে সে কোন পথ-পদ্ধতি অনুকরণ করছে-এসব বিষয়ে তাবলীগী জামাতের কোন খবর নেই।

জবাব

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে..

জনাব বন্ধু মহোদয়!...ওয়ালাইকুমুস সালাম!

আপনার বিস্তারিত চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। এর দ্বারা আন্দায করতে পেরেছি যে, তাবলীগী জামাতের কার্যক্রম সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ আপনার বেশ মহব্বত রয়েছে এবং এটাকে আপনি দ্বীনের সহীহ খিদমত হিসেবে বিশ্বাসও করেন। কিন্তু তার সাথে এও অনুভব করতে পেরেছি যে, আপনার মিজায এখনো পুরো তাবলীগী হতে পারেনি। যদি আপনি পূরো তাবলীগী হতে পারতেন, তাহলে এ সম্পর্কে আপনার কোন ফিকিরই হতো না যে, জামাতে ইসলামীর এ সকল প্রচারণার জবাব কোন লেখা বা প্রবন্ধের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে, বরং আপনার প্রচেষ্টা তখন এদিকে ব্যয়িত হতো যে, কিভাবে ঐ সকল ভাইদেরকে তাবলীগের কার্যক্রমগুলোই এভাবে দেখানো যায় যার ফলে তারা এর সকল দিক, কার্যক্রম, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল স্বচক্ষে দেখে নিতে সক্ষম হয়। তাবলীগওয়ালাদের আমলী দর্শন, কার্যপদ্ধতি মূলত: এটাই এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এটা যে, যারা বক্তৃতা ও লিখার দ্বারা আশ্বস্ত হতে পারে না, তারা ব্যক্তিগতভাবে স্বজ্ঞানে, স্বচোখে দেখার পর আর দুরে না থেকে বরং তাবলীগওয়ালাদের সাথে একান্তভাবে শরীক হয়ে যায়। অবশ্য আল্লাহ্‌পাক যদি কাউকে এর তৌফীক না দেন, তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

সর্বপ্রথম আমার ঘটনাই শুনুন। হয়ত আপনি শুনে থাকবেন কারো নিকট। 'আমি জামাতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই মরহুম জনাব মওদুদী সাহেবের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতাম। তার চিন্তাধারা এবং লিখার দ্বারা বিশেষভাবে আমি প্রভাবিত ছিলাম। যেন আমি তার আশেক। আজ যাঁরা জামাতে ইসলামীতে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছেন, তাঁদের অনেকেই তখন মওদুদী সাহেবকে চিনতেনও না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন জামাতে

ইসলামী প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন আমি জনাব মওদুদী সাহেবের সাথে জামাতের প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অত:পর যখন জামাতে ইসলামীর অফিস লাহোর থেকে দারুসসালাম স্থানান্তরিত হয় এবং জনাব মওদুদী সাহেবও সেখানে চলে যান, তখন আমিও হিজরত করে সেখানে চলে যাই। তাঁর সাথে একত্রে থাকাকালীন অবস্থাতেই এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যাতে শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকেই আমি এ কথা ভাবতে বাধ্য হলাম যে, আমাকে জামাতে ইসলামীর রোকন হিসেবে থাকা উচিত, না না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কয়েক মাস পর চিন্তা-ভাবনা করে আমি আমার ব্যাপারে এটাই সিদ্ধান্ত নিলাম; এখন আমার পক্ষে জামাতের রোকন হিসেবে থাকা উচিত হবে না। আমার এ সিদ্ধান্তের কারণ তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন মৌলিক মতনৈক্য ছিল না। আমি তখনো তাদেরই দাওয়াত এবং জামাতে ইসলামীর কার্যক্রমকে সঠিক ও নির্ভুল মনে করতাম। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার লিখা 'মাওলানা মওদুদী সে মেরী রিফাকাত কী সারগুযাশত' নামক পুস্তক পাঠে জানা যেতে পারে।

তখন পর্যন্ত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন জানা শোনা ছিল না। যদিও একবার তাঁকে দেখেছিলাম এবং সাক্ষাতও করেছিলাম তাঁর সাথে। কিন্তু আমার মনে তখন তাঁর ব্যাপারে বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি এবং তাঁর তাবলীগী কার্যক্রম পথ-পদ্ধতি সম্পর্কেও ছিলাম অনবহিত। এখনও আমার মনে পড়ে, যদি কোন ব্যক্তি এ তাবলীগের কাজে শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিত এবং বয়ান ও লেখার দ্বারা বুঝাতে চেষ্টা করত, তখন আমার মাঝে কিছুতেই তা বিশেষ কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত না। আমার চিন্তা-ধারায় তখন একটা ভিন্ন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ছিল অন্যরকম। ফলে জামাতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছুদিন পরেই একটি আশ্চর্য ঘটনার প্রেক্ষিতে (যাকে গায়েবী রহস্য বললেও ভুল হবে না) কিছুদিন আমাকে রায়পুর জেলার সাহারানপুর খানকায় হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী সাহেবের (রাহঃ) খিদমতে থাকার সুযোগ হয়। যদিও আমি হযরতের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিনি। এমনকি তখন খানকার যিকির-আযকার ইত্যাদির সাথে আমার

কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু হযরতের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি খুবই প্রভাবিত ছিলাম ও তাঁকে ভক্তি করতাম। একদা হযরত কথা প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)-এর নাম উচ্চারণ করলেন অত্যন্ত উচ্ছসিত প্রসংশার সুরে। সাধারণত: যা ছিল তার স্বভাববিরোধী এবং তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি আপনি দিল্লী যান, তাহলে হযরত মাওলানা ইলিয়াসের (রাহঃ) খেদমতে অবশ্যই যাবেন।

এর দু'চার দিন পরের কথা। আমার তখনকার বাসস্থান বেরেলীতে ফিরে আসার জন্য রায়পুর থেকে সাহারানপুরে আসলাম। ওখানে এসেই শুনতে পেলাম-হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ভাবলাম-এক্ষুণি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা ও সেবা শুশ্রুষা করা প্রয়োজন। খোদা না করুন আবার এমন না হয়ে যায় যে, এ রোগেই তিনি এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। আর তাঁর সুহবত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আফসোস আমার মনে সর্বদা থেকে যায়। এই ভেবে আমি সাহারানপুর থেকে সোজা দিল্লী চলে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম হযরত ভীষণ অসুস্থ এবং নেহায়েত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শরীরে হাড্ডি আর চামড়া ভিন্ন আর কিছুই যেন অবশিষ্ট ছিল না। আমি তাঁর সাথে মুসাফাহা করতে চাইলে, তিনি আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন এবং অন্য কোন কথা বা ভূমিকা ছাড়াই বললেন-আমাকে দেখতে এসেছেন কেন? দ্বীনের জন্য ফিকির করুন। আমি বললাম-আমি প্রস্তুত জনাব? তিনি পুনরায় বললেন, ওয়াদা করুন আমার সঙ্গে কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় দিবেন। আমি তার অসুস্থতা ও দুর্বলতার অবস্থা দৃষ্টে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ওয়াদা করে ফেললাম।

এ আলোচনা হয়েছিল ইশার নামাযের অনেক পরে। আমি তখনই নিজামুদ্দীনে পৌঁছে গেলাম এবং পরের দিন ফজরের পরপরই পুনরায় হযরতের দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন-এখন চলে যান। আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি সুস্থ হয়ে যাব। তারপর যখন কাজের জন্য সফর করব, তখন আপনাকে খবর পৌঁছাব। আপনি এক সপ্তাহের প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবেন। তারপর আমি বেরেলীতে চলে আসলাম।

আসল ঘটনা হলো, জানা শোনা ব্যতীত কোন কাজর জন্য এক সপ্তাহ সময় দেয়া ছিল আমার সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। অথচ এদিকে ওয়াদা করে এসেছি। (আসলে এটা যেন ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতেরই কারিশমা) আমার স্মরণ হচ্ছে না কতদিন পর হযরত মাওলানার পক্ষ থেকে খবর এসেছিল যে, অমুক তারিখে আমি জামাতের সাথে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। আপনি বেরেলী থেকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে যান। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছে গেলাম। হযরত মাওলানা দিল্লী থেকে তাশরীফ নিয়ে আসলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে বললেন–আপনি আমার সাথে থাকবেন। আর এক সপ্তাহ পূর্ণ হবার পূর্বে আপনি এ কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন কিংবা কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না। যা কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে এক সপ্তাহ পরে করবেন। আমি নিজেকে সেভাবে তৈরী করে নিলাম। বেশী নয় ৪/৫ দিন অতিবাহিত হবার পরই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, উম্মতের মাঝে ঈমান ও ঈমানী যিন্দেগী গড়ার নেহায়েত সঠিক পন্থা এটা। এ বিশ্বাস আমার দিবা রাতের বন্ধুত্ব এবং অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় এবং সাথে সাথে এও আন্দায হয়ে যায়, যদি হযরত মাওলানা আমাকে আলোচনা বা বর্ণনার মাধ্যমে তা বুঝাবার চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত আমি আশ্বস্ত হতে পারতাম না।

পবিত্র কুরআনেও এ হেকমতটির বাস্তব দৃষ্টান্ত মিলে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে কালামে মজীদে এসেছে, যখন মিসরের বাদশার স্ত্রী (জুলায়খা নামের প্রসিদ্ধ মহিলা, যার গৃহে হযরত ইউসুফ (আঃ) কৃতদাস হিসেবে থাকতেন) তাঁর উপর আসক্ত হলেন, তখন মিসরের মহিলাদের মাঝে এর সমালোচনা শুরু হয়ে গেল এবং তার বান্ধবীরা এটাকে হীন চরিত্রের কাজ ভাবতে লাগলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–যখন জুলায়খার নিকট তার বান্ধবীদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি বুদ্ধি করে সকলকে দাওয়াত করলেন এবং তাদের সামনে এমন ধরনের খাদ্য সামগ্রী রাখা হল, যেগুলো ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। ফলে সকলের হাতে একটা করে ছুরি দেয়া হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আঃ)কে সেখানে ডাকলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) কৃতদাস ছিলেন বিধায় জুলায়খার ডাকে তৎক্ষণাত সেখানে উপস্থিত হলেন। আগত

মহিলাদের দৃষ্টি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি পড়তেই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে সবাই তন্ময় হয়ে গেলেন। সবাই যেন বেহুঁস প্রায়। এ অবস্থায় ফল কাটার পরিবর্তে সকলেই হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলল। জুলায়খা তখন সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, এই সেই ব্যক্তি, যার মহব্বতের কারণে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছিলে। এখন তোমাদের অবস্থা কী হল?

জুলায়খা তার বান্ধবীদের তিরস্কারের জবাব প্রদানে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য কোন দীর্ঘ বক্তৃতা করেননি। কোন প্রবন্ধ পাঠ করে শুনাননি। ব্যাস! হযরত ইউসুফ (আঃ)কে এক নজর দেখিয়ে দিলেন শুধু। এমনিভাবে হযরত ইলিয়াস (রাহঃ)ও পবিত্র কুরআনের এ দর্শনটি বাস্তবায়িত করলেন।

ব্যক্তিগত এ অভিজ্ঞতার পর তাবলীগী কার্যক্রম প্রসঙ্গে আমি নিজেও এ পন্থা অবলম্বন করেছি এবং একে সফল ও সার্থক রূপেই পেয়েছি। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ)-এর ইন্তিকালের পর ১৯৪৪ কিংবা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে আমি তাবলীগের এক জামাতের সাথে দিল্লী থেকে পেশওয়ার পর্যন্ত সফর করেছিলাম। আমাকেই জামাতের আমীর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। পথিমধ্যে ২/৩ দিন লাহোরে আমাদের অবস্থান করতে হয়। পূর্ব পরামর্শক্রমে এক মসজিদে অবস্থান করছিলাম। শেষ দিন সকাল বেলা এক ব্যক্তি আসলেন এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন–আপনার বন্ধু হাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব এম, আই আমারও বন্ধুদের একজন। তিনি আপনার এবং আপনার জামাত সম্পর্কে বলেছিলেন। আমি আপনার জামাতের কার্যক্রম এবং এর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে এসেছি। যদি আমার মনোপুত হয়, তাহলে আমিও এতে শরীক হব।

তাঁর কথার দ্বারা বুঝা গেল, তিনি টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ অফিসের একজন কর্মকর্তা। আমি তাঁকে নেহায়েত বিনয়ের সাথে বললাম–দেখুন জনাব! আমি নিজেকে এরূপ যোগ্য মনে করছি না যে, আপনার ন্যায় একজন জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিকে এ কাজের ব্যাপারে কিছু বলে আশ্বস্ত করতে পারব। একাজটি দেখা, আমল করার সাথে সম্পৃক্ত। আমি নিজেও তা দেখে ও আমল করেই কিছু অর্জন করেছি। সুতরাং আপনার দরবারে আমার বিনীত নিবেদন, আমরা আজ এখান থেকে রওয়ানা হয়ে অমুক সময় অমুক স্থান

থেকে ট্রেনে যাত্রা করব ইনশাআল্লাহ্। আপনার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তাহলে চার দিনের জন্য আমাদের সাথে থাকুন। আমার কথাশুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। অত:পর বললেন–পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় কি রয়েছে, যা বলার দ্বারা বুঝে আসে না? আমি শুনেছি আপনি সবাইকে একই কথা বলেন 'সাথে চলুন, দেখুন, তাহলে বুঝে আসবে'। আপনি তাহলে গোটা পৃথিবীর সকল মানুষকে বেকুফ এবং মুর্খ ভাবছেন। আমরা জনাব মওদুদী সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর জামাতে ইসলামীর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, প্রথমে আমার এ আলমারী ভর্তি কিতাব পড়ে নাও, তারপর কথা বলতে এসো। আপনার কাছে আসলে আপনি বলেন, প্রথমে চিল্লা দিন কিংবা দশদিন বা তিন দিনের জন্য সাথে চলুন। মোটকথা, ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার সময় এ কথাগুলো বলে গেলেন। আমি তার ক্ষোভ ভাঙ্গাতে কিছু বলার চেষ্টা করি কিন্তু তারপরও বাহ্যত: তিনি ক্ষিপ্তই রয়ে গেলেন এবং চলে গেলেন।

ট্রেনের সময় হলে যখন আমাদের জামাত ষ্টেশনে পৌঁছল। তখন দেখি সে ব্যক্তি ব্যাগ হাতে উপস্থিত। আমাকে অনেকটা ধমকের সুরে বললেন–এই নিন, তিন দিনের জন্য আপনার সাথে থাকতে এসেই গেলাম। সুতরাং সে তিন দিন তিনি আমাদের সাথে রইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই তিন দিনে এমন রহমত নাযিল করলেন যে, তাবলীগের কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে গেলেন। পরিস্কার হয়ে গেল সবকিছু তাঁর সামনে। এমনকি পরবর্তীতে তিনি পূর্ণ তাবলীগীই বনে গিয়েছিলেন। অথচ এ অধম (লিখক) নিজেও এখনো পুরো তাবলীগী হতে পারেনি।

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء

'এটা আল্লাহ্র মেহেরবানী। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন'।

ইনিই হলেন আমাদের সম্মানিত বন্ধু, ভাই আবদুল হামীদ সাহেব। পরবর্তীতে যিনি পাকিস্তানের টেলিফোন ও তার বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলের পদ পেয়েছিলেন এবং এ চাকুরী থেকেই শেষ পর্যন্ত অবসরপ্রাপ্ত হন। তিন দিন পূর্ণ হবার পর কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিতে গিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন–মৌখিক আলোচনা না করে আপনি আমার

উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। যদি আমাকে মৌখিকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত আমার বুঝে আসত না এবং এভাবে আমার চিত্তে প্রশান্তিও আসত না।

এই সফরেই ২য় আরেকটি ঘটনা ঘটেছে রাওয়ালপিন্ডিতে। মসজিদেই আমাদের অবস্থান ছিল। আমার প্রতি দিনের নিয়ম ছিল–ফজরের নামাযের পর জামাতের সাথী এবং নামায পড়ার পর এলাকার যে সকল লোক বসে যেত, তাদেরকে নিয়ে বসে 'রিয়াজুস সালেহীন' থেকে হাদীস পড়ে তার তরজমা এবং কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে শোনাতাম। একদা দরস সমাপ্ত হবার পর একজন লোক (জ্ঞানী বিচক্ষণ বলেই মনে হল) বললেন, জনাব আপনার সাথে আমি নির্জনে কিছু কথা বলতে চাই। আমি পৃথকভাবে তাঁর সাথে বসে গেলাম। ভদ্রলোক বললেন, আমি তাবলীগী কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই এবং তাবলীগ সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্নও আছে আপনি এজাযত দিলে সেগুলোও উল্লেখ করতে চাই। আমি আমার নিয়মানুযায়ী তাকে খুবই বিনয়ের সাথে বললাম–আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত যোগ্যতা মোটেও রাখি না এবং আপনাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে আপনাকে সবিনয় নিবেদন এই জানার যে, আমার জামাত আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ এখান থেকে পেশওয়ার রওয়ানা হবে, আপনি জামাতে আমাদের সাথে চলুন। এর বিস্তারিত কার্যক্রম স্বচোখে দেখে নিবেন এবং এরপর আপনার সিদ্ধান্ত যা হয় তাই বাস্তবায়িত করবেন। ভদ্রলোক বললেন–আমি এখানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি। সুতরাং আপনাদের সাথে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি বললাম–আমি এরচেয়ে বেশী আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যখনই সুযোগ দেন, তখনই এর কার্যক্রমগুলো স্বচোখে দেখে নিবেন। ভাবলাম–ইনি বোধ হয় স্বগৃহে ফিরে গেছেন। কিন্তু পরের দিনও তাকে ফজরের জামাতে দেখলাম–তিনি 'রিয়াজুস সালেহীন'-এর দরসে উপস্থিত ছিলেন। দরস সমাপ্ত হবার পর আগের দিনের ন্যায় আজও তিনি নির্জনে কিছু বলতে চাইলেন। আমি আজও নির্জনে তাঁর সাথে বসলাম। তিনি বললেন, জনাব! আমি আপনার সঙ্গে সফর করতে

পারলাম না সত্য, তবে গতকাল সকাল বেলা আপনার সাথে আলোচনার পর আজকের দিন ও রাত্রটি জামাতের সাথে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং কাটিয়েছিও। আমি শুধু আপনার দরবারে এটুকু আরয করতে চাই, আল্লাহ্‌র ফজলে আপনাদের এ জামাতের সাথে এ কিছু সময় থাকার ফলে আমি দ্বীনীভাবে অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার ঈমানে এক নতুন শক্তি অনুভব করছি। সাথে সাথে অনেক প্রশ্নের সমাধানও আমার হয়ে গেছে। এরপর তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রাওয়ালপিন্ডি থেকে আমাদের জামাত পেশওয়ার চলে গেল। সেখানে কুহাটেও আমরা সফর করেছি এবং এটাই ছিল আমাদের সফরের সর্বশেষ মঞ্জিল। তারপর আমরা যার যার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলাম।

এ ঘটনার ২/৩ মাস পর জনাব মওদুদী সাহেবের পত্রিকা 'তরজমানুল কুরআনে' (যা তৎকালীন সময়ে জামাতে ইসলামীর একমাত্র মুখপত্র ছিল) এক ব্যক্তির একটি চিঠি প্রকাশিত হল। চিঠিটি জামাতে ইসলামীর আমীর বরাবর লিখা ছিল। চিঠির বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

'আমি ৩ বছর ধরে জামাতে ইসলামীর রোকন এবং জামাতে ইসলামীর সংস্পর্শে এসে আমার ইলমী এবং দ্বীনী বহু ফায়দা হয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি আরো একটি দ্বীনী জামাতের সাথে আমার ২৪ ঘন্টা সময় দেয়ার সুযোগ হয়েছে। তাদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, জামাতে ইসলামীর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাতো পরিপূর্ণ নয়ই, বরং অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ।

এ জামাতটির সাথে থেকে আমার মনে হল—এ লোকগুলো সবই যেন জান্নাতী। তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে যে পরিবর্তন আমার নসীব হয়েছে, ইতিপূর্বে তা কখনো হয়নি। তাই আপনার কাছে আমার নিবেদন—জামাতে ইসলামীর যিম্মাদারদের আরো চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে, আমাদের মাঝে কি অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং সাথে সাথে সে অসম্পূর্ণতাগুলো পূর্ণতায় রূপ দেয়া দরকার।'

আমার স্মরণ আছে, তরজমানুল কুরআনে স্বয়ং মাওলানা বা জামাতের অন্য কোন যিম্মাদারের পক্ষ থেকে উক্ত চিঠির উত্তর দেয়া হয়েছিল।

চিঠিটা পড়ে আমার মনে হল–যে ভদ্রলোক জনাব মওদুদী সাহেব বরাবর চিঠিটা লিখেছেন, বোধ হয় তাবলীগী জামাতের সাথে তাঁর সময় দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। তরজমানুল কুরআনের দায়িত্বশীলদের মধ্য হতে কয়েক জনের সাথে আমার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম–চিঠিটা কার লেখা? কোথায় থাকেন তিনি? তাঁরা জানালেন–ভদ্রলোক পিন্ডির অধিবাসী। তাঁর নামটিও তাঁরা আমাকে জানিয়ে ছিলেন তখন, কিন্তু এখন আমার স্মরণ নেই। তারপর রাওয়ালপিন্ডিতে আমার এক বন্ধুর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, যিনি রাওয়াল পিন্ডিতে আমার সাথে সাক্ষাতের পর একদিন এক রাত জামাতের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি। যদি তিনি ২/৪ দিন জামাতের সাথে থাকতে পারতেন, তাহলে জামাতে ইসলামীর কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণতার দৃষ্টিতেই শুধু যাচাই করতেন না, বরং ভ্রান্ত না সঠিক সে ব্যাপারেও তার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যেত।

মোটকথা, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা যে, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ পদ্ধতিতে আমল করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তার সাথে দু'আরও এহতিমাম করার তৌফিক মিলেছে, তখন ফলাফল এই হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত হল।

আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করুন। মূলত: জনাব মওদুদী সাহেব তার লিখার দ্বারা ঐ সকল বেচারাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, সে ছাড়া অন্য সব লোকদের দ্বীনী ধ্যান-ধারণা সব অসম্পূর্ণ। দ্বীনকে একমাত্র তিনিই বুঝেছেন। আমাদের পূর্বসুরীরা দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে বুঝেননি। এমনকি 'লাইলা হা ইল্লাল্লাহ...' এর উদ্দেশ্যও নাকি তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি। ধৃষ্টতা আর কাকে বলে!

এজন্যে আপনার নিকট আমার আবেদন, জামাতে ইসলামীর কোন সদস্য যখন আপনার নিকট এ ধরনের কোন প্রসঙ্গ তুলবে, যা আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। অথবা যদি তাঁদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা বলার সুযোগ হয়, তাহলে শুধু কয়েকবার মারকাযে নিযামুদ্দীনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। বিশেষ করে ফজরের পরের বয়ান যেন অবশ্যই তারা

শোনেন, যা অধিকাংশ সময় মাওলানা ওমর পালনপুরী সাহেব করে থাকেন এবং জামাত বিদায় নেয়ার সময় যে সকল হেদায়াতী বয়ান দেয়া হয়, সেগুলোও যেন মনযোগ সহকারে শোনেন। সাথে সাথে বিদায়ী মুনাজাতেও যেন শরীক হন। যদি ২/৪ বার এরূপ করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন, তাবলীগী জামাত ইসলামের কোন বিশেষ অংশের শিক্ষা দিচ্ছে, নাকি হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সকল হিদায়াত এবং শিক্ষার জাহিরী ও বাতিনী দিকের উপর আমল করে যাচ্ছে। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক থেকে বঞ্চিত না করে থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সকল ভ্রান্ত ধারণা দুরীভূত হয়ে তার সম্মুখে প্রকৃত সত্যের দরওয়াযা খুলে যাবে।

হ্যাঁ তবে এ সকল বয়ানে ফ্যাশনী কায়দার পরিভাষা, নেতাসুলভ আদর্শ ও অত্যাধুনিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সম্ভার নেই। যার অনুসরণ করা হচ্ছে খুব বেশী ৪০/৫০ বছর ধরে। কিন্তু তাবলীগের পরিভাষা কুরআনে পাক এবং নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদের পুরাতন পরিভাষারই বিশ্লেষণ। যার দ্বারা দ্বীনের দাওয়াত এমনভাবে সামনে উত্থাপন করা হয়, যেভাবে হযরত হাসান বসরী (রাহঃ), হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ), ইমাম গায্যালী (রাহঃ), হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহঃ) প্রমুখের ন্যায় আল্লাহ্র মকবুল বান্দারা নিজের যামানায় লোকদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতেন।

জামাতে ইসলামীর লিটারেচর মতে এ সকল আল্লাহ্ওয়ালাদের দ্বীনী ধ্যান-ধারণা সব অসম্পূর্ণ ছিল এবং তারা নাকি দ্বীনের একটি বিশেষ অংশের দাওয়াত দিতেন। দ্বীনের পরিপূর্ণ দাওয়াত নিয়ে এ যামানায় একমাত্র জনাব মওদুদী সাহেবই দাঁড়িয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং মাওলানাকে ক্ষমা করুন।

মোটকথা আমার নিকট এ সকল ভাইদের খিদমত ও মঙ্গল কামনার পদ্ধতি এটাই যা, আমি উপরে বর্ণনা করলাম। কিন্তু এর দ্বারা প্রত্যেকেই হিদায়াত পেয়ে যাবে; এটা জরুরী নয়। কুরআনেপাক আল্লাহ্র কালাম। এর পূরাটাই হিদায়াতের মাধ্যম। তা সত্ত্বেও কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

বলেছেন, 'পবিত্র কুরআন অনেককেই গোমরাহ করে আবার অনেককেই হেদায়াত দান করে (সূরা বাকারা)

সুতরাং আপনার কাজ এখন শুধু ইখলাসের সাথে সঠিক পদ্ধতিতে নিজের এবং সাথে সাথে অন্য ভাইদেরও হিদায়াতের চেষ্টা করা এবং এমর্মে আল্লাহ্র নিকট সর্বদা প্রার্থনা করা। কারণ–বাস্তবায়িত হবে তো তাই, যা আল্লাহ্ মঞ্জুর করে রাখেন।

আর যদি আপনি তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর ও সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনি তাদের জবাব দিবেন? কোন্ কোন্ অপবাদের সাফই গাবেন? কারণ–যা কিছু আপনি চিঠিতে উল্লেখ করছেন, তাতো কিছুটা উঁচু তবকার লোকদের মন্তব্য। তাদের মধ্যে যারা নীচু তবকার এবং যাদের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে, তারা তো এর চেয়েও জঘণ্য মন্তব্য তাবলীগ সম্পর্কে করে থাকে। তারা শুধু মন্তব্যই করে না, বরং রীতিমত সেসব লিখে যাচ্ছে। আমার ধারণা; এর দ্বারা জামাতে ইসলামীর ভদ্র মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের মনেও ঘৃণার উদ্রেক হয়।

প্রায় এক বৎসর কিংবা তার চেয়ে কিছু কম-বেশী হতে পারে–জনৈক ভদ্রলোক 'তাজাল্লী' নামক পুস্তকের একটি পাতা আমাকে দেখালেন। সেটাতে জামাতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট একজন লিখেছিলেন, দেশে জরুরী আইন ঘোষণাকালে যখন জামাতে ইসলামীর লোকদেরকে জেলে বন্দী করা হয়েছিল, তখন তাবলীগী জামাতের লোকেরা তাদেরকে বলত–'যদি আপনারা আমাদের জামাতে শরীক হন, তাহলে বন্ধিত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারেন।'

এটা কত হীন ও কষ্টকর উক্তি। আর এ কথা স্পষ্ট যে, যিনি একথাগুলো রটিয়েছেন, তিনি তাবলীগী জামাত সম্পর্কে এতই বে-খবর যে, তিনি এটাও জানেন না যে, তাবলীগী জামাত 'জামাত ইসলামী' অথবা 'জমিয়তে উলামা'র মত কোন পার্টি বা সংগঠন নয়। যার জন্য কোন সদস্য মেম্বার, সেক্রেটারী ও সভাপতি ও সহযোগী নির্দিষ্ট করতে হয়। এটা তো কেবল শুধু নিজের ও উম্মতের ইসলাহের জন্য মেহনত ও কুরবানীর দা'ওয়াত মাত্র এবং তার কর্মপদ্ধতিও একটাই। এর জন্য নেই কোন অফিস, নেই কোন রেজিষ্ট্রি

বুক, নেই কোন প্রচারপত্র, নেই অন্য তেমন কিছু এবং এর নামটিও 'তাবলীগী জামাত' এমনভাবে রাখা হয়নি, যেমনভাবে অন্য কোন দল বা সংগঠনের নাম রাখা হয়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) বলেন–এর নাম তাবলীগী জামাত আমি রাখিনি। বরং আমরা শুধু কাজ করতে চেয়েছিলাম। এর জন্য কোন নাম নির্ধারণ করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু লোকেরা জামাতের সাথীদেরকে 'তাবলীগী জামাত' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। এরপর এটা এতই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, আমরাও বলতে শুরু করলাম।

মোটকথা, আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন–জামাতে ইসলামীর কতিপয় লোক তো তাবলীগ সম্পর্কে এহেন কটুক্তি করে। সুতরাং আপনি কতক্ষণ তাদের এসবের উত্তর দিতে থাকবেন।

সাথে সাথে আপনার চিঠি দ্বারা এও বুঝতে পেরেছি যে, বেরেলভী পন্থীদের সম্পর্কে আপনার কোন খবর নেই। আমার ধারণা; আপনি যে এলাকায় থাকেন সে এলাকা উক্ত বালা থেকে মুক্ত।

তাবলীগী জামাত সম্পর্কে বেরেলভীদের প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে লোকেরা বিভিন্ন এলাকা থেকে আমার নিকট পত্র লিখছে এবং তাদের লিফলেট এবং প্রচারপত্র ইত্যাদি আমার নিকট পাঠাচ্ছে। যদি আপনি সে লিফলেট বা প্রচার পত্রগুলো দেখেন, তাহলে জামাতে ইসলামীকে গনীমত মনে করবেন।

এই বেরেলভীদের সাথে এক সময় আমার বেশ সম্পর্ক ছিল। এ জন্য আমি তাদের ধ্যান-ধারণা ও স্বভাব–চরিত্র সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, তাবলীগী জামাতের কার্যক্রমের কারণে পৃথিবীর মাটি আমাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে এবং আমাদের তৃণভূমি আমাদেরই জন্য মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। সে জন্য তারা তাদের সমস্ত শক্তি এক সাথে ব্যয় করছে তাবলীগওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডায়। তাদের নিকট জামাতে ইসলামীর ন্যায় পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম নেই। তাই তারা লিফলেট, পোষ্টার ছাপিয়ে যতসব অপবাদের গোলা বর্ষণ করতে লেগে গেছে। আর তাদের পেশাদার বক্তাদের বক্তৃতা থেকে যেন অগ্নি ঝরে। তবে তাদের এ সকল প্রোপাগান্ডা খুবই নীচু মানের, যা ঐ সকল লোকদেরকেই প্রভাবিত করে, যাদের শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান গরিমার কোন

বালাই নেই এবং মনে হয় তারাই তাদের একমাত্র সম্বল। আমি আরো জানতে পেরেছি–তারা তাবলীগের এ আচরণটির ব্যাপারে খুবই পেরেশান যে তাবলীগওয়ালাগণ কারো প্রশ্নের জবাব দেয় না বা কোন প্রোপাগান্ডায় কান দেয় না। সামান্য থেকে সামান্যতম এবং নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম কোন অপবাদকেও তারা প্রতিহত করার চেষ্টা করে না। যার কারণে রণক্ষেত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না এবং যুদ্ধও এগোয় না সামনের দিকে।

আসল কথা আমি নিজেও এক সময় তাবলীগের মুরুব্বীদের এ ধারণাটির সাথে একমত ছিলাম না। আমি চাইতাম তাবলীগের বিরুদ্ধে যে সকল প্রচারণা একেবারে স্পষ্ট অপবাদ, সেগুলোর উচিত জবাব দেয়া হোক এবং কঠিনভাবে প্রতিহত করা হোক। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। তাবলীগী কার্যক্রম সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এ ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক যা তাঁরা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। ব্যাস! নিজের কাজ নিজে করতে থাকুন, বিরুদ্ধবাদীদেরকে আল্লাহ্‌র হাওয়ালা করে দিন, তাদের জন্য দু'আ করতে থাকুন। তবে নিজের হিসেব ঠিক রাখুন।

প্রায় বিশ/পচিশ বছর পূর্বের ঘটনা। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রাহঃ) তখন জীবিত। পাকিস্তানে তাবলীগী ইজতিমা হল। সে ইজতিমায় মাওঃ মরহুমও তাশরীফ আনলেন। ইজতিমার পর জামাতে ইসলামীর কোন এক পত্রিকায় হযরত মাওলানা সম্পর্কে এমন একটি কথা প্রকাশ করা হল, যা আমার জানামতে নিঃসন্দেহে গলদ ছিল। আমি এর জবাব দেয়া একান্ত প্রয়োজন মনে করলাম এবং হযরত মাওলানার খিদমতে এর অনুমতি প্রার্থনা করলাম। মাওলানা উত্তরে বললেন, আপনি এর জবাবে কিছুই লিখবেন না। যদি আপনি এর জবাব দিন, তাহলে তারাও আপনার জবাবের জবাব লিখবে এবং আরো জোরদার করে লিখবে। পূনরায় আপনি জবাব দিলে তারা আরো কঠোরভাবে আপনার জবাব দিবে। ফলাফল এই দাঁড়াবে, যে গলদ অপবাদটি ওরা একবার ছেপেছে সেটাকে ২ বার ৩ বার আরো জোরদার করে ছাপাবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) এবং তারপর হযরত মাওলানা ইউসুফ (রাহঃ) খুবই কঠিনভাবে এ নিয়মের উপর কায়েম থেকেছেন।

একটি কথা আরো আপনাকে ভাবতে হবে। জামাতে ইসলামী ভাইদের ঐ সকল কথার জবাব দেয়ার চেষ্টা করলে কী উপকার হবে? আমার ন্যায় আপনারও জানা আছে–প্রচার প্রসার ও প্রোপাগান্ডার দিক দিয়ে এবং উপস্থাপনাভঙ্গি ইত্যাদির ব্যাপারে ভারত পাকিস্তানে অন্য সকল রাজনৈতিক সংগঠনের চেয়ে জামাতে ইসলামী বহুগুনে শক্তিশালী। আর তাবলীগী জামাত সম্পর্কে অপনিও জানেন, তারা পত্র-পত্রিকা ও পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে তাদের কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছানোরও পক্ষপাতি নয় এবং এ ব্যাপারে তারা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন যে, কোন পত্র-পত্রিকায় তাদের কার্যক্রমের স্বপক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশিত হোক–এতেও তারা রাজী নন।

আমার অভিজ্ঞতার একটি ঘটনা। এক স্থানে তাবলীগী ইজতিমা হচ্ছিল। তাবলীগওয়ালারা জানতে পারলেন, কতিপয় পত্রিকা ইজতিমার দৈনন্দিনের বয়ান ও কার্যক্রম গুরুত্বসহকারে প্রচারের পদক্ষেপ নিয়েছে। তখন তাবলীগের উপরস্থ মুরব্বীদের একটি দল পত্রিকা অফিসে গিয়ে অনুনয় বিনয়ের সাথে আরয করলেন; আমাদের এ প্রোগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশ না করাই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা হবে। সাংবাদিকদেরকে বুঝালেন–যদিও এটা কোন গোপনীয় বিষয় নয়, তথাপি এর মঙ্গলজনক দিক হচ্ছে–পত্র পত্রিকায় এর কোন প্রচারণা না হওয়া। তাদের এ চিন্তা-ধারার সাথে কেউ একমত হোক আর না হোক তাঁরা তাদের এ উসূলকে আকড়ে ধরে আছেন।

কেউ কেউ তাবলীগী জামাতে এমন কিছু লোক দেখে একান্তভাবে প্রশ্ন তুলেন; বাহ্যিক লেবাসে সুরতেও তাদের দ্বীনদারী নেই। তাদেরকে বলা উচিত যে, তাবলীগী জামাত তো ব্যাভিচারী, শরাব পানকারী এমনকি এর চেয়েও জঘণ্য অন্যায়কারীকেও খোশামোদ–তোষামোদ করে সাথে নিয়ে থাকে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রাহঃ) বলেন–আমি তো ধোপার ন্যায় কাপড় পরিষ্কার করার জন্য পানি গরম করার পাত্র বসিয়েছি, তাতে মেথরের কাপড়ও আসবে। অতঃপর আল্লাহ্পাক যেটি ইচ্ছা পবিত্র করবেন।

আমি যখন আপনার চিঠির উত্তর লিখতে বসেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম আপনার চিঠি থেকে আমার উত্তর হয়ত সামান্য বড় হবে। কিন্তু কথায় কথা

বেড়ে যায়, ফলে এটা উত্তরের স্থানে এক নিবন্ধে রূপ নিয়েছে। তাই এখন ভাবছি 'আল ফুরকান' আগামী অক্টোবর সংখ্যায় আপনার চিঠি এবং উত্তরটি ছেপে দিব। যেহেতু চিঠিটা প্রচার করার কথা আপনি বলেননি তাই সেখানে আপনার নাম দেয়া হবে না। সর্বশেষে আরো একটি কথা বলে রাখছি, জামাতে ইসলামীর কতিপয় লোক কিন্তু এমনও রয়েছেন, যারা আপনার ন্যায় মানুষের পিছনে লাগতে ভুল করেন না এবং তারা কোন প্রকারেই আপনাকে ছাড়বেন না। হয়ত এ ব্যাপারে তারা খুবই মুখলিস। তাদের পিছু ছাড়ানোর একটি পদ্ধতি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা হয়ত সংশোধনের ওসীলাও হয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি একটি বই ছাপা হয়েছে। আফসোস! উক্ত বইটির নাম আমার নিকট খুবই অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে। এমনকি নামটি বইটির উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও ক্ষতিকর। যদি এটি প্রকাশের পূর্বে আমি জানতে পারতাম, তাহলে লিখক এবং সংকলক বরাবর পরামর্শ দিতাম যেন তারা এ নামটি পাল্টিয়ে রাখেন। পুস্তকটির নাম 'আপবীতি কী রওশনী মে মওদুদীয়াত বে-নেকাব'।

বইটিতে মূলত: কতিপয় এমন কিছু লিখকের প্রবন্ধ–নিবন্ধ সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যারা এক সময় জামাতে ইসলামীর প্রথম কাতারের রোকন এবং উর্ধ্বতন আহবায়ক ছিলেন এবং জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মওদুদী সাহেবের বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু বছর কয়েক পরে যখন তারা অনুভব করতে পারলেন, স্বচোখে দেখতে পেলেন, মওদুদী সাহেব দ্বীনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর দল জামাতে ইসলামীর বুনিয়াদ যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত: সে ব্যাখ্যা দ্বীনের এক ধরনের বিকৃতি সাধন এবং এ পথ বক্রতা ও ভ্রষ্টতার' এই ভেবে তারা মওদুদী সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং জামাতে ইসলামী থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। অত:পর তাঁরা 'আপ বীতি কী রওশনী মে মওদুদীয়াত বে-নেকাব' নামক বইটিতে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এরা অধমেরও পরিচিত। তাঁরা জামাতের কোন সাধারণ রোকন ছিলেন না, বরং অনেকে তাঁর প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তাঁরা সে বইটিতে যা কিছু লিখেছেন, তা 'সত্যের

সাক্ষী' এবং জামাতে ইসলামীর সদস্যদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি শক্তিশালী প্রমাণ। আমিও সে প্রবন্ধগুলো পড়েছি। আমার রায় হচ্ছে–সত্য সন্ধানী এবং মুখলেস যে কেউ এ প্রবন্ধগুলো পড়বেন, যদি আল্লাহ্পাক তাকে সঠিক জ্ঞান দান করে থাকেন এবং সত্য সন্ধিৎসু হৃদয় দিয়ে থাকেন, তাহলে তাদের এ বিচ্ছিন্নতাকে সত্য সঠিক বলেই জানবেন এবং তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেন। সাথে সাথে এটিও জানা যাবে যে, জামাতে ইসলামীর ভাইয়েরা জনাব 'মওদুদী সাহেবের' ব্যাপারে এবং 'দ্বীন' সম্পর্কে কতটুকু ভ্রান্তির মধ্যে পতিত। সুতরাং আমার পরামর্শ হল–আপনি বইটি সংগ্রহ করে নিবেন। আর আপনার যে সকল বন্ধু-বান্ধন আপনার নিকট আপনার চিঠিতে উল্লেখিত প্রশ্নের ন্যায় এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাদেরকে উক্ত বইটি পড়তে দিবেন।

আমার ধারণা–দ্বীন সম্পর্কে মওদুদী সাহেব এবং জামাতে ইসলামীর মারাত্মক ও বিপদজনক ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অবগতি ও সতর্ক করার জন্য এ পর্যন্ত যত বই লিখা হয়েছে এবং আমার চোখে পড়েছে, তন্মধ্যে এই বইটি সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ ও উপকারী। বইটির সংকলক আগ্রা শহরের মুফতী মাওলানা আবদুল কুদ্দুস রুমী।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার জবাব পূরা হয়ে গেছে। এবার আপনাকে (আল ফুরকানের মাধ্যমে) এবং যারা তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের খেদমতে এই আরয করা প্রয়োজন মনে করছি যে, অন্যান্যদের প্রশ্ন ও আপত্তি-অপবাদের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে লক্ষ্য দেয়া উচিত এবং নিজের হিসেব নেয়া উচিত।

আমার সব সময়ের ধারণা; ইজতিমা এবং মারকাযে জামাত বিদায়ের প্রাক্কালে যে হেদায়াতী বয়ান দেয়া হয়, মূলত: তা ইসলাহ (আত্মশুদ্ধি), হেদায়াত ও তার জন্য দ্বীনী মেহনতের এক পরিপূর্ণ সিলেবাস। সে হেদায়াতী বয়ানের যেন পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই অধম (লিখক) তো এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় মারকাযে পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের মুখলেস ভাইদের মুখে শুনে থাকি–কাজের তত্ত্বাবধানে বেশ ভিন্নতা ও ব্যতিক্রম হচ্ছে। আমার নিকট এর বিশেষ কারণ এটাই যে, অনেক

সাথীই এখন এ হেদায়াতী বয়ানকে শুধু প্রথা হিসেবে শুনে নেয়। ফলে আমলের প্রতি যে পরিমাণ গুরুত্ব দানের কথা ছিল, তা মোটেও হচ্ছে না। তাই সর্বশেষ আবেদন হল, জান প্রাণ দিয়ে সেগুলোর এহতেমাম করা দরকার। ইজতিমায় এবং মারকাযে হেদায়াতের আমল শুধু প্রথা হিসেবেই যেন না হয়, বরং হেদায়াতী বয়ান প্রদানকারীদের চিন্তা, প্রচেষ্টা এবং আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ যেন এই হয় যে, সাথী ভাইদের অন্তরে কথাগুলো বসে যাক। আর শ্রোতা সাথী ভাইদের ফিকির যেন এই হয় যে, যা বলা হচ্ছে তা আমরা এমনভাবে গ্রহণ করে নেই, যেন তার আলোকে জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হতে পারি। আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়–জামাতে যারা দাওয়াতী বয়ান রাখবেন, তাঁরা যদি আলেম না হন এবং তাবলীগে সময় দা· কারী আলেমদের সংস্পর্শেও বেশী দিন না থাকেন, তাহলে তাঁরা যেন দাওয়াতী আলোচনায় হযরত মাওলানা এনামুল হক বা হযরত মাওলানা ওমর পালনপূরীর অনুকরণ করেন, বয়ান লম্বা করার চেষ্টা না করেন। সাধাসিধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা উচিত। যেমন মেওয়াতের পুরানো মিয়াজী সাহেবগণ করতেন। তারা নেহায়েত সাধাসিধে এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতেন। আমার মতে ঐ সকল অক্ষরজ্ঞানহীন কিংবা নেহায়েত স্বল্প পড়ুয়া মুখলেস বান্দাদের সাধাসিধে বয়ানে আল্লাহ্‌র হাজারো বান্দা জান্নাতী বনে গেছেন।

যিনি এখনো তাবলীগী কার্যক্রম ভালভাবে বুঝে নেননি, এর তারতীব এখনো শিখেননি, তাঁকে দাওয়াতী আলোচনার জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ–এর ফলে এমন এমন কথাও আমার কানে এসেছে, যেগুলো খুবই চিন্তা ও পেরেশানীতে ফেলে এবং এর ফলশ্রুতিতে আলেমদের মনেও তাবলীগী সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এবং আপনাকে স্বীয় দ্বীনী সকল ভুল ভ্রান্তি থেকে হেদায়াত দান করুন। আমীন।

–ওয়াসসালাম

২৩ শে জিলকদ ৯৯ হিজরী, ১৬ই অক্টোবর ১৯৭৯ইং

তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে রেজভীগ্রুপের প্রোপাগান্ডা

-মাওলানা মনজুর নোমানী

হায়দরাবাদের অধিবাসী এক ভাই [তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তাবলীগ জামাতের দ্বীনী মেহনতে শরীক হয়ে স্বীয় জীবনের ইসলাহ এবং আখেরাতের ফিকির করার তৌফিক দিয়েছেন] নেহায়েত দুঃখ-বেদনার সাথে এক চিঠিতে আমাকে জানিয়েছেন, (বেরেলী সিলসিলার) জনৈক মৌলভী সাহেব আমাদের এলাকায় এসে বিশ/পচিশ দিন এখানে অবস্থান করে একাধারে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ অপবাদ ছড়িয়েছেন। জনসাধারণকে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, এ জামাত পথভ্রষ্ট, এমনকি কাফের এবং রাসূলের দুশমনদের জামাত এটি। সুতরাং এ জামাতের লোকদের সংস্পর্শেও যাবেন না, বরং প্রচন্ডভাবে তাদের বিরোধীতা ও মুকাবিলা করবেন। তাদেরকে আপনাদের মসজিদে অবস্থান ও কথা বলার অনুমতি এমনকি মসজিদে আসারও সুযোগ দিবেন না। ......ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি এও লিখেছেন যে, তাবলীগ জামা'আত ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই এমন বহু লোক তাদের এ প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়েছেন এবং তারা তাবলীগের বিরোধীতা করতে শুরু করেছেন। এমনকি কোন কোন শ্রেণী ও মহল্লায় কাজ করাও জটিল হয়ে পড়ছে।

মোটকথা, এরূপ বহু চিঠি-পত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমার নিকট ধারাবাহিকভাবে আসতে লাগল। তাঁরা আমার নিকট পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখেছেন, এহেন পরস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি? ফলশ্রুতিতে আমি এ সম্পর্কে কিছু মূলনীতি 'আল ফুরকান' পত্রিকায় লিখে দেয়া সঙ্গত মনে করছি।

পবিত্র কুরআনে বার বার এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির সময় যখন শয়তান স্বীয় আত্মগর্ব ও অহংকারের দরুন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হলো, তখন সে আল্লাহ্র দরবারে আবেদন করল, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে সে সুযোগটুকু দেয়া হল। তখনই সে এ শপথ করেছিল যে, আমি আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ঠ ও গোমরাহ করে আমার দলে শামিল করার ব্যাপারে পূর্ণ চেষ্টা চালাব।

সুতরাং তার এ প্রচেষ্টা প্রতি যুগেই জারী রয়েছে। পবিত্র কুরআনে রয়েছে, এ পৃথিবীতে যখনই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নবী-রাসূল হেদায়াতের মহান বার্তা নিয়ে তাশরীফ এনেছেন এবং পথহারা মানব সন্তানদেরকে আল্লাহ্র পথে ডেকেছেন, তখনই শয়তান, জ্বিন জাতি এবং মানুষদের মধ্যে যারা তার চেলা-চামুন্ড ছিল তারা তাঁদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগেছ।

وكذالك جعلنا لكل نبئ عدوا شياطين الانس والجن

সবশেষে আমাদের সর্দারে দূজাহান ও পথ প্রদর্শক খাতামুন্নাবীয়্যীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশরীফ আনলেন এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে তাওহীদ এবং দ্বীনে হক্কের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন শয়তানই মক্কার নিকৃষ্ট মানব আবু জাহল আবু লাহাব ও অন্যান্য লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল।

যার বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের মোটামুটি জানা আছে। তাঁর যুগে এবং তাঁর পরবর্তী যুগেও সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত শয়তান তার কোশেশ করা সত্ত্বেও মহানবীর উম্মতদেরকে গোমরাহ্ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে বিভিন্ন কারণে মানুষের ঈমান, ইল্ম-আমলে দুর্বলতা দেখা দিল। ফলে তারা শয়তানের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকতে পারল না। স্বয়ং মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন আক্বীদাগত গোমরাহী, আমল-আখলাকে ত্রুটি-বিচ্যুতি শয়তানী প্রচেষ্টার ফলে দেখা দিতে শুরু করল। পাশাপাশি আল্লাহ্র একদল বান্দাকে তিনি ইসলাহ এবং শয়তানী

প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তৌফিক দান করলেন। ভ্রষ্টতা এবং হেদায়াত এ দু'টি ধারা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এবং চলছে এখনো। এরই মাঝে হক্ব পন্থীদেরকে যদিও কখনো কখনো কঠিন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং বাহ্যত: শতায়তানী প্রচেষ্টায় হক্ব এবং হক্ব পন্থীদের জন্য পরিবেশ খুবই প্রতিকুল এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। [যেমন কখনো কখনো আম্বিয়া কিরামের সামনেও অনুরূপ হয়েছে।] কিন্তু শেষ ফলাফলে আল্লাহর মদদে হক্ব ও হেদায়াত পন্থীদের জন্যই বিজয় অর্জিত হয়েছে। [সত্য সমাগত। মিথ্যা অপসারিত, মিথ্যাতো অপসারিত হওয়ারই বস্তু।]

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে হক্ব ও বাতিল, হিদায়াত ও গোমরাহী এবং ওলী আল্লাহ ও শয়তানের চেলা-চামুন্ডদের কার্যক্রমের সারাংশ এতটুকুই যা উপরে বর্ণিত হল।

সুতরাং এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যখন যেখানে বান্দার হিদায়াত ও ইসলাহের জন্য কোশেশ করা হবে শয়তান এবং তার চেলা-চামুন্ডদের পক্ষ হতে এর বিরোধীতা ও প্রোপাগান্ডা হবে নিশ্চয়। বিশেষ করে আমাদের এ শতাব্দীতে বেরেলী সিল্‌সিলার কুফুরী ফতোয়া দানের ঠিকাদাররা এই মিশনকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে যে, মনে হয়–এ কাজের জন্যই যেন তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ আমি স্বচোখে দেখে আসছি, যখন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা অথবা কোন জামাত অথবা কোন তবকা উম্মতে মুহাম্মদীকে শয়তানের ছোবল থেকে বাঁচাতে এবং ফাসিকী, শিরক, বিদ'আত, আল্লাহ্‌ বিস্মৃতি, আখিরাত সম্পর্কে উদাসিনতা প্রভৃতির কলুষতা অন্তর থেকে দুরীভূত করার চেষ্টা করেছে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কিছু হেদায়াত হতে শুরু হয়েছে, তখনই এ বেরেলী গ্রুপ তাদের পিছনে লেগে গেছে। নানান প্রকার অপবাদের ঝড় বইয়ে দিয়েছে। তাদের প্রতি কুফুরীর তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করছে।

হযরত মাওলানা রশীদ অহমদ গাঙ্গুহী (রাহঃ), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (রাহঃ) এবং তাঁদের পরবর্তী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) প্রভৃতি আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ ও আকাবিরে সাহারানপুর, যাঁরা স্বীয় যামানায় নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার দ্বীনী খিদমত ও ইসলাহের জন্যে নিজেকে উৎস্বর্গ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ সকল হযরত এবং তাদের বন্ধু বান্ধবগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর আনিত দ্বীনের আনুগত্যশীল সিপাহসালার এবং সৈনিক ছিলেন। তাঁদের হৃদয়, যবান এবং কলম তথা সকল কিছুর প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে ছিল যে, উম্মতে মুহাম্মদী শয়তানী প্রভাব ও বিষক্রিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথে চলুক এবং তাঁর নক্শে কদমের অনুসরণ করুক। [তাদের এ পরিশ্রমের ফল আজ শুধু এ ভারত উপমহাদেশেই নয়, বরং প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে প্রত্যেক দৃষ্টিবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।] কিন্তু কুফুরী ফতোয়াদানের ঠিকাদার ঐ সকল প্রবৃত্তি পুজারী (যারা জেনে হোক কিংবা না জেনে নিঃসন্দেহে শয়তানের চেলা) এ সকল মহামনীষীদের বিরুদ্ধেও প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) এরা রাসূলের দুশমন। তাদের প্রতি এরূপ আক্বীদা এবং ঐ অপবাদ চাপিয়েছে যেগুলো সম্পর্কে–এ সকল মনীষীগণই বার বার লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের আক্বীদা বা বিশ্বাস রাখবে এবং এ সকল কথা বলবে বা লিখবে সে ইসলাম থেকে খারিজ। অতঃপর উলামায়ে দেওবন্দের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি ছাড়াই হাজারো লক্ষ বার লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে এর বাস্তবতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যার পর কারো জন্যে খারাপ ধারণাতো দূরের কথা বরং সন্দেহপ্রবণ হওয়ারও কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই কুলাঙ্গারদের আচরণে আজ পর্যন্ত সামান্য পরিবর্তন আসেনি।

এমনিভাবে এখন থেকে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে যখন হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জমুরাদাবাদী (রাহঃ)-এর বিচক্ষণ খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গীরী (রাহঃ)-এর দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে বিভিন্ন রকম চিন্তাধারায় সংশ্লিষ্ট উলামাদের এক জামাত 'নদওয়াতুল উলামা' নামে প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন। যাঁরা উম্মতে মুসলিমার ইসলাহ; বিশেষ করে জনসাধারণ ও উলামায়ে কিরামের মাঝে ইত্তেহাদ, সহযোগিতা ও সম্মিলিত কার্যক্রমের জন্য একটি আন্দোলনের আকারে প্রচেষ্টা শুরু করেন। তখন বেরেলী গ্রুপের প্রধান, আ'লা হযরত(?) মাওলানা আহমদ রেজা খান বেরলভী। কুফুরী ফতোয়ার জান্ডা হাতে নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরই এক নিকটতম শাগরেদ (তিনি তাঁর খলীফাও ছিলেন) গর্বের সাথে লিখেছেন যে, আ'লা হযরত প্রায় একশত পুস্তক 'নদওয়াতুল উলামার' বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রতিহত করতে ও কুফুরী ফতোয়া দানে লিখেছেন এবং এ আন্দোলনকে সফল করে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। (রেজা স্মৃতিচারণ)

নদওয়াতুল উলামার দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে শুরুর দিকে জবাব দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের উপর কুফুরীর ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে, আমরা সেগুলো থেকে নিঃসন্দেহে মুক্ত। আমরা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, কুরআন মজীদ এবং প্রয়োজনীয় দ্বীনের সকল বিষয়ের উপর ঈমান রাখি এবং আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। কিন্তু তারপরও কুফরী ফতোয়ার মেশিনগানের গোলাবর্ষণ বরাবর অব্যাহত রইল।

এ সকল অভিজ্ঞতা আমাকে এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছে যে, এ সকল বেরেলী পন্থীদের জবাব দেয়া আর সাফাই গাওয়ার প্রচেষ্টা অনর্থক, বরং তাবলীগী কাজ করনেওয়ালাদের উচিত ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পরকালের প্রতিদানকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিজের ইসলাহ এবং দ্বীন ও উম্মতের কাজ বরাবর করতে থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা যার তৌফীক এনায়েত করেছেন এবং ধর্মীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যার সঠিক ও মকবুল হওয়াতে কোন সন্দেহ হতে পারে না, যার নিকট কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান রয়েছে এবং যে তাবলীগ জামাতের উসূল এবং কার্যক্রম সম্পর্কেও ভালভাবে জানেন। তাবলীগ জামাত এবং তার কার্যক্রমের মাক্সাদ এ টুকুই যে, 'উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে ঈমানওয়ালা যিন্দেগী ব্যাপক হয়ে যাক।'

এই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জামাতের এক বিশেষ আমলী প্রোগ্রাম রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে ক'টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

(১) ইসলামের সর্বপ্রথম ভিত্তি কালেমায়ে তাইয়েবাহ এর উপর যেন ঈমান নসীব হয়ে যায়। এ কালেমার মাহাত্ম্য গুরুত্ব পুরোপুরি অন্তরে এসে যায়। এতে যে বাস্তবতা নিহিত রয়েছে, তার উপর অন্তরে বিশ্বাস নসীব হয়ে যায় এবং নিজের জীবনকে এরই ছাঁচে যেন ঢেলে সাজানো যায়।

(২) নামায যেন জীবনের একটি অঙ্গে পরিণত হয়। একে যথাসম্ভব সঠিকভাবে এবং উত্তম থেকে উত্তমভাবে আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে বরাবর উন্নতি (বাহ্যিক আধ্যাত্মিক অবস্থাগত ও পরিমাণগত) হতে থাকা এবং তা হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত তরীকায় আদায় করার ফিকির ও প্রচেষ্টা যেন চলতে থাকে।

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের প্রয়োজন মাফিক দ্বীন শিক্ষা করা জরুরী মনে করে এবং শিখার ফিকির ও চেষ্টা করতে থাকে।

(৪) আল্লাহ্র যিকির-ফিকির যেন (যার মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ, ইস্তেগফার, দরূদ শরীফ ইত্যাদি শামিল) আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় কিংবা কমপক্ষে সকাল সন্ধ্যার ওযীফা বনে যায়।

(৫) আমাদের আখলাক-চরিত্র এবং আমাদের সামাজিকতাকে যেন হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মত হয়ে যায়। যার সারমর্ম হচ্ছে–আমরা যেন যথাসাধ্য আল্লাহ্র বান্দাদের খেদমত এবং শান্তি পৌঁছানোর ফিকির করি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যেন কারো হক নষ্ট না হয়, আমার দ্বারা যেন কারো ক্ষতি বা কষ্ট না হয়।

(৬) আমাদের কার্যক্রম শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আমরা এ বিষয়টিকে অভ্যাসে পরিণত করি এবং এর অনুশীলন করি। (তাবলীগী পরিভাষায় এটাকেই ইখলাস এবং তাছহীহে নিয়্যত বলা হয়)

(৭) সর্বশেষ কথা হচ্ছে, উপরোল্লিখিত ৬টি বিষয় নিজের ভিতর সৃষ্টির অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমশ: এগুলোর উন্নয়ন ও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে এবং অপর ভাইকে এ বিষয়গুলোরই দাওয়াত দেয়া ও উৎসাহিত করার জন্য

সুযোগ হলে জামাতের সাথে দূরে অথবা কাছে পায়দল ও সওয়ারীর উপর আরোহণ করে সফর করতে হবে। এই জামাতই যেন ভ্রাম্যমান বিদ্যাপীঠ ও খানকাহ এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাফেলার ন্যায় হয়ে যায়। এর ফলে দ্বীনের পথে কষ্ট বরদাশত করা এবং নিজের উপার্জন থেকে খরচ করার অভ্যাস সৃষ্টি হবে এবং দ্বীনের মধ্যে মজবুতী আসবে।

তাবলীগী জামাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জানেন যে, তাবলীগী ইজতিমা এবং তাবলীগী সফরে বিশেষ করে তাঁদেরকে এ সব বিষয়েরই দাওয়াত দেয়া হয় এবং এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

যে সকল জামাত কোন ইজতিমা থেকে বা তাবলীগী মারকায থেকে রওয়ানা হয়, তাদেরকে খোলাখুলিভাবে এ বিষয়গুলোরই হেদায়াত দেয়া হয় এবং কার্যপদ্ধতি বাতলে দেয়া হয়।

এতে আশা করা যায়, দ্বীন এবং আহলে দ্বীনের ইসলাহের ফিকির তার অন্তরে ইন্‌শা আল্লাহ্ অবশ্যই সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং অধিকাংশের বেলায় হয়ও তাই।

চিন্তার বিষয় যে, এ সকল কথা ও কাজ কি কাফের এবং রাসূলের দুশমনেরা কখনো করবে? বেরেলী সিলসিলার যে সকল মৌলভী সাহেব তাবলীগের এ কার্যক্রমকে কুফরী, গোমরাহী এবং এ জামাতকে কাফের এবং রাসূলের দুশমনের জামাত বলেন, তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে দেয়া উচিত। কিন্তু যারা সাধাসিধে অনভিজ্ঞ মুসলমান তাদের এ সকল প্রোপাগান্ডায় জড়িয়ে পড়ছে তারা নিঃসন্দেহে করুনার পাত্র। তাদের জন্য দিল থেকে প্রার্থনা করা উচিত এবং ইখলাস ও সহমর্মিতার সাথে চেষ্টা করা উচিৎ যে, তারা যেন দিল্লীর মারকাযে যেতে পারে এবং সেখানে গিয়ে তাবলীগের কার্যক্রম এবং তাবলীগ করনেওয়ালাদের হাল-অবস্থা আল্লাহ্‌র দেয়া চক্ষু দিয়ে তারা দেখে আসে যে, তারা কি বলে এবং কি করে। অথবা কমপক্ষে পার্শ্ববর্তী কোন এলাকায় অনুষ্ঠিতব্য কোন ইজতিমায় শরীক হয়। ইনশাআল্লাহ তাহলে তারাও আপনার সাথে দ্বীনের এ খিদমত ও দাওয়াতে স্বীয় ইসলাহের ফিকিরে লেগে যাবে।

সবশেষে তাবলীগের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদেরকে দিয়েছেন, তাঁদের খিদমতে আরয, আপনাদের দৃষ্টি শুধু এতেই নিবদ্ধ হওয়া চাই যে, আপনার কাজ এবং আপনার দ্বীনী মেহনত শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের প্রতিদানের জন্য। আপনার কোন কথাই যেন শরীয়তের খেলাফ না হয় এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সর্বদা নিজের হিসাব রাখবেন।

যদি আপনার জন্য এ কাজটুকু নসীব হয়, তাহলে সমস্ত পৃথিবীও যদি আপনার বিপক্ষে দাঁড়ায় এবং কাফের নাস্তিক প্রভৃতি খেতাব দিতে লেগে যায়, তাহলেও আপনার কিছু যাবে-আসবে না। আপনার প্রতিপালক আপনার উপর সন্তুষ্ট এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ আপনার প্রতি খুশী থাকবে। এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি হতে পারে। আর যদি খোদা না করুন আপনার নিয়তে গোলমাল থাকে। পার্থিব কোন মাকসাদ কিংবা নফসের জয্বায় পড়ে তাবলীগের কাজ করে থাকেন। অথবা অসাবধানতা ও বেপরোয়া মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে আপনি তাবলীগে যেয়ে গলদ কথা-বার্তা আলোচনা করেন, (যেমন কখনো কখনো কোন লোককে দেখা গেছে) তাহলে কখনো আপনার জন্যে তা কল্যাণ বলে আনবে না। এ অবস্থায় যদি সমস্ত পৃথিবী আপনার উপর বিশ্বাসী হয়ে যায় এবং আপনার গলায় প্রসংশার ফুলের হারও দেয়া হয়, তাতেও স্বয়ং আপনার পরিণাম ভাল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে ইখলাস দান করুন এবং স্বীয় ইসলাহ ও নাজাতের ফিকির আমাদের ক্বলবে প্রবল করে দিন। তার বিশেষ দয়া ও রহমত্ দ্বারা আমাদের হিফাজত এবং সংশোধন নসীব করুন। আমীন।

তাবলীগী জামাত এবং জামাতে ইসলামী

এ পুস্তকে ইতিপূর্বেই উক্ত শিরোনামে একটি নিবন্ধ পাঠকবর্গ পড়েছেন, যাতে ছিল এক ব্যক্তির সুদীর্ঘ চিঠি। সে চিঠিতে জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাবলীগ জামাত এবং তার কার্যক্রমের ব্যাপারে কৃত প্রশ্নাদি উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমি (লেখক) আল-ফুরকানের সম্পাদকের পক্ষ থেকে তার জবাব দিয়েছি।

আমার জবাবের সার কথা ছিল-তাবলীগ জামাতের আকাবিরগণের উসূল হচ্ছে-প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন এবং অপবাদের জবাবে সময় নষ্ট করা যাবে না, কেবল এতটুকু চেষ্টা করা হবে, যাতে অভিযোগকারীগণ দ্বীনের এ মেহনত এবং প্রচেষ্টায় শরীক হয়ে এ কার্যক্রম নিজের চোখে দেখে নিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ফরমে এতটুকু আশাবাদী হওয়া উচিত যে, যদি সেসব ভাইয়েরা মুখলিস হন, তাহলে তাদের সকল প্রশ্নাদি এবং অভিযোগ এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। আল ফুরকান পত্রিকায় এ কথাগুলো অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখা হয়েছে। আমার নিকট জামাত এবং এর আকাবিরগণের উসূলের ভিত্তিতে চিঠির জবাব এতটুকুই ছিল। কিন্তু কোন কোন ভাই লিখেছেন, তাদের প্রশ্নের জবাবে কিছু লিখা প্রয়োজন এবং এর দ্বারা ফায়দাই হবে ইনশাআল্লাহ। তাই নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ক'টি লাইন লিখে দেয়ার চেষ্টা করছি।

উল্লেখিত চিঠিতে জামাতে ইসলামীর যে প্রশ্নগুলো লিখা হয়েছিল, তার সারকথা ছিল নিম্নরূপঃ তাবলীগ জামাত মূলত: মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় কোন সমস্যা; চাই সেটা রাজনৈতিক হোক বা সামাজিক সেগুলোর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। বাতিল চিন্তা-ধারা এবং কুফুরী জীবন-পদ্ধতি দ্বারা যারা মানব সমাজকে পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারেও তাবলীগীদের কোন চিন্তা নেই।

এছাড়া কোন কোন উক্তি তো সে প্রশ্নে এমনও ছিল, যা শুধুই অপবাদ ও অজ্ঞানতার ফসল।

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল–তাবলীগী কার্যক্রমের বুনিয়াদ কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী ইতিহাসের আলোকে অর্জিত এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, বর্তমান বিশ্বে উম্মতে মুসলিমার ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়েও যে সকল সমস্যাবলী রয়েছে, তার মূল কারণ হলো–অধিকাংশ উম্মত আজ হাকীকী ঈমান বিল গাইব এবং ঈমানী যিন্দেগী থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে, যা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সুদৃষ্টি প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। আর উম্মতের মাঝে খোদা বিমুখতা এবং আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা ছেয়ে গেছে, যা যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরামের উম্মতদের জীবনে পৃথিবীতেই ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ডেকে এনেছে। উম্মতের বর্তমান পরিস্থিতিই আজ অন্যান্য জাতিগুলোকে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাথে সাথে এ বিশ্বাসও তাবলীগী কার্যক্রমের বুনিয়াদ যে, এ পার্থিব জীবনের সকল সমস্যা অপেক্ষা পারলৌকিক সমস্যা লক্ষ গুণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পার্থিব সমস্যাবলী নিয়ে ভাববার মানুষের কোন অভাব নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন দিক দিয়ে এতে জড়িয়ে আছে এবং এর জন্য সর্বদা মাথা ঘামাচ্ছে। কিন্তু পারলৌকিক সমস্যা নিয়ে ভাবনায় দৌড়-ঝাপকারীদেরকে দেখার জন্যে আকাশ শুধু অশ্রু বর্ষণ করছে।

মোটকথা, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ এ বিশ্বাসকে বুনিয়াদ বানিয়েই নিজের সকল প্রচেষ্টা এদিকে ব্যয় করছেন যে, উম্মতের মাঝে ঈমান, ঈমানওয়ালা যিন্দেগী এবং আখেরাতের ফিকির ব্যাপক করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হোক, তাদের নিকট উম্মতের সকল মুশকিলাত ও সমস্যা সমাধানের এটাই রাজপথ। এপথ ছাড়া সকল প্রচেষ্টা–তদবীরে উম্মতের সফলতা ও উত্তরণের কোন আশা নেই। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি দল বা মুসলমান পার্থিব সমস্যাবলীর সমাধান করার জন্যে সাধারণত: রাজনৈতিক, জাতীয় ও শ্রেণীগত দল গঠনের পথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন–মুসলিমলীগ, মুসলিম মজলিস, জমীয়তুল উলামা, জামাতে ইসলামী,

মজলিসে মুশাওরাত প্রভৃতি; তাবলীগ জামাত তাদের জন্য তো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেই না, বরং তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করে থাকে।

জামাতে ইসলামীর প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে–আসল দ্বীন শুধু তাই, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। যাকে মৌলিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ঈমান ও বিশ্বাস। দ্বিতীয় ঈমানী যিন্দেগী। এতে কোন রদবদল কিয়ামত পর্যন্ত হবে না। তাবলীগ জামাত এই আসল দ্বীনকেই নিজে অর্জন করা এবং উম্মতের মাঝে ব্যাপক করা স্বীয় জীবনের মূল টার্গেট বানিয়েছে।

পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তনে নানান প্রশ্নাবলীর উদ্ভব ঘটেছে, বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং উম্মতের আলেম শ্রেণী (দার্শনিক ও ফকীহ্‌গণ) নিজেদের অবস্থানে থেকে সে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। এ সকল জবাবাদী যদিও দ্বীনী সিলসিলার এক প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আসল দ্বীন নয়। এতে বর্ণনাকারীদের মতনৈক্যও রয়ে গেছে। সর্ব প্রথম এ ধরনের প্রশ্ন প্রথম হিজরীতে কিছু বিশেষ খেয়াল ও চিন্তা-ধারা সম্পন্ন অনারবদের ইসলামের গন্ডিভুক্ত হওয়ার ফলে কিংবা গ্রীক দর্শনের প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল।

তাদের জবাব মু'তাযিলারা স্বীয় বিবেকপ্রসূত ধারণা অনুযায়ী প্রদান করেছিল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণ নিজের উসূল অনুযায়ী প্রদান করেছেন। এরপরও প্রায় প্রতি যুগেই এমনিরূপ নিত্য নতুন প্রশ্ন-অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী আলেমগণ স্বীয় উসূলমত নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাদের জবাব দিয়ে চলেছেন। ১৮৫৭ সালের মহা সমস্যা এবং আমাদের এ দেশের উপর ইংরেজদের পরিপূর্ণ আধিপত্যলাভের পর পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়ায় এদেশেও নিত্য-নতুন অনেক সমস্যাবলীর সৃষ্টি হয়েছে। সে গুলোর উত্তর স্বাধীন মতে অথচ পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং তার সহচরগণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। অপর দিকে আহলে

সুন্নতের উসূল অনুযায়ী সে সময়ের উলামায়ে হক হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রাহঃ) এবং মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহঃ) তাফসীরে হককানী ইত্যাদি দ্বারা জবাব দিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এ সকল সমস্যার জবাবাদী মূলতঃ আসল দ্বীন নয়, এগুলো নিজ নিজ সময়ের ইলমে কালাম। [আকায়িদ শাস্ত্র] অতঃপর আমাদের যুগেও বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কিছু নতুন রাজনৈতিক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। হয়েছে কমিউনিজমের ন্যায় নাস্তিক্যবাদী জীবন পদ্ধতির উদ্ভব। এগুলো সম্পর্কে এ যামানার ইসলামী দার্শনিকগণ নিজ নিজ পদ্ধতিতে জবাব দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সকল ইলমে কালাম, আসল দ্বীন নয় এবং না একথা বলা যাবে যে, এসব সঠিক এবং সত্য ও সকল ভুল ভ্রান্তিমুক্ত।

মোটকথা, তাবলীগ জামাত আসল দ্বীনের দাঈ, জাতীয় সমস্যা কিংবা ইলমে কালাম তাদের মূল টার্গেট নয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর আশা করি বুঝতে সহজ হবে যে, জামাতে ইসলামীর যেসব সদস্য তাবলীগের দাওয়াতের উপর উপরোল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাঁরা 'আসল দ্বীন' এবং ইলমে কালাম 'সাময়িক ও জাতীয় সমস্যাবলীর' পার্থক্যটাই বুঝেন না। আসল ঘটনা হল–তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত আসল দ্বীনের খেদমত দাওয়াতকে স্বীয় জীবনের মূল লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। তাদের আহবান শুধু এই–'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আন এবং হে-ঈমানদারগণ! পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর' জামাতের মুরুব্বীদের বক্তব্য শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বাস্তবতা বুঝতে সক্ষম হবেন। যদি বুঝতে আগ্রহী হোন এবং কেউ যদি স্বচোখে উপরোক্ত বাস্তব সত্যটি প্রত্যক্ষ করতে চান, তিনি তা দেখতে পারেন তাবলীগের মুরুব্বীদের সাথে কাজে শরীক হয়ে।